লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৯ বর্ষ ■ ৫ম ও ষষ্ঠ সংখ্যা

১৫ আশ্বিন, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ ■ ৬ রমযান, ১৪২৭ হিজরি

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ ঈসাব্দ

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

পোপ উপস্থাপিত বক্তব্য ও যুগ-খলীফার প্রতিক্রিয়া

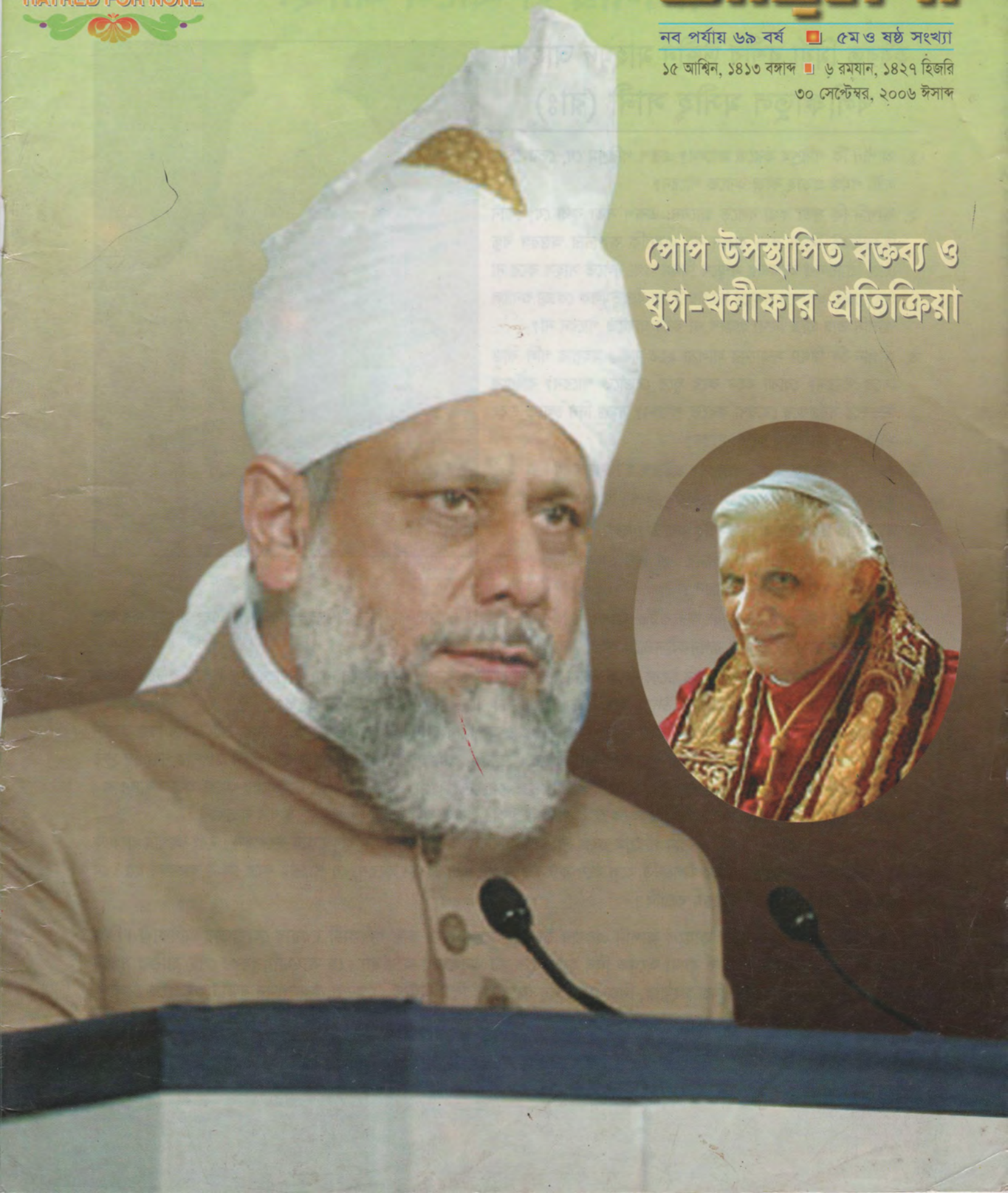

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাদের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোজা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয়নি সে আদৌ পরিশ্রম করেনি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুনরায় সজীব হবে।

সম্পাদকীয়

তাক্‌ওয়ার পোষাকই উত্তম

মহান আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন-খুযূ যিনাতাকুম ইনদা কুল্লি মাসজিদিন অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেক মসজিদে সৌন্দর্য অবলম্বন করো (সূরা আ'রাফ)। আবার বলা হয়েছে লিবাসুত্তাক্‌ওয়া খায়ের অর্থাৎ তাক্‌ওয়ার পোষাকই উত্তম। উল্লেখ্য, মসজিদকে সজ্জিত করতে বলা হয়নি, বলা হয়েছে নিজেদেরকে তাক্‌ওয়ার পোষাকে সুসজ্জিত হতে। এমনকি হাদীস পাঠে এ-ও জানা যায় যে, শেষ যুগে মসজিদগুলো হবে বিরাট বিরাট চাকচিক্যপূর্ণ, থাকবে হেদায়াতশূণ্য। অথচ এ সজ্জিত হওয়ার আদেশটি মসজিদে নববী, ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে বর্ষা হলে যে মসজিদে সিজদার সময় কপালে কাদাও লেগে যেতো, সেই মসজিদের ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ সজ্জিত হওয়ার বিষয়টি প্রযোজ্য। এখন প্রশ্ন জাগে তাক্‌ওয়া কী?

সাধারণভাবে তাক্‌ওয়ার অর্থ খোদা-ভীরুতা, ভয়-ভক্তি ও ভালবাসার সাথে প্রেমাস্পদ ও আরাধ্যজনকে মসীহ্ করে চলা। তাঁর মান-মর্যাদা ও প্রতাপ প্রতিপত্তির ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা যেন কোনক্রমেই তা ক্ষুন্ন না হয়। তিনি যেন কোনভাবে নারাজ না হন। বাঘ ভালুককে যেভাবে ভয় করা হয় এ ভয় সেই ভয় নয়। প্রেমাস্পদের কোন্ জিনিসটা ভাল লাগে কোন্‌টা তার অপসন্দ এ ব্যাপারে মানুষ যেভাবে সচেতন থাকে বা যেভাবে তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা হয়, খোদার ব্যাপারে তাক্‌ওয়া অবলম্বন বলতে আমরা তাই বুঝতে পারি। কোন কোন বুযুর্গ তাক্‌ওয়া বুঝাবার জন্যে এভাবে উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন একজন মানুষ এমন একটি রাস্তা অতিক্রম করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করে যার দু'পার্শ্বে কাটার গাছ রয়েছে যেন তার কাপড় না ছিড়ে বা তার গায়ে কাঁটার খোঁচা না লাগে। আবার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলার সময়ে মানুষ সাবধান হয়ে চলে যেন বাঘ ভালুক বা সাপের সম্মুখীন হতে না হয়। তাক্‌ওয়ার ব্যাপারটাও কতকটা তাই। মানুষ যেন সর্বদা আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির দিকটাকে বেশি করে লক্ষ্য রাখে। দিনের শুরু থেকে বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যদি তার প্রতিটি পদক্ষেপে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে, তার প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিটি কর্মে খোদা সন্তুষ্ট আছেন তো, খোদা তার প্রতি অসন্তুষ্ট তো নন। এটাকেই বলা হয় তাক্‌ওয়া অবলম্বন। যে কোন কর্ম কেবল এবং কেবলই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যেন হয়, তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। খোদা তার সব কিছু দেখছেন এ ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাস থাকতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর এক পংক্তিতে খুব সুন্দর বলেছেন-সুবহানা মাঁইয়ারানী-অর্থাৎ পবিত্র সেই সত্তা যিনি আমাকে সর্বদাই দেখছেন। এ হলো তাক্‌ওয়ার মূল কথা।

ধর্মের ভিত্তিই হলো তাক্‌ওয়া। যে কর্মের ভিত্তি তাক্‌ওয়ার ওপরে নয় তা সৎকর্ম হতে পারে না। আর তা খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতেও ব্যর্থ। সুতরাং আমাদের অন্তর তাক্‌ওয়ার পোষাকে যদি সজ্জিত করতে সক্ষম হই, তাহলে আমরা যে সত্যিকার সৌন্দর্যে মন্ডিত হতে পারবো তাতে কোন সন্দেহ নেই। নচেৎ আমাদের সকল কর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্‌র নিকট কোন প্রকার কপটতা ও ধোঁকাবাজি করার অবকাশ নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সর্বদা তাক্‌ওয়ার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "নিশ্চিতভাবে স্মরণ রাখো, কোন কর্ম খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, যা তাক্‌ওয়া-শূন্য। প্রত্যেক পুণ্যের মূল তাক্‌ওয়া।
যে কাজে এ মূল বিনষ্ট হবে না সে কাজও বিনষ্ট হবে না" (কিশতিয়ে নূহ, পৃঃ ৩১)। তিনি আরও বলেন, "আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক শোভা তাক্‌ওয়া হতেই সৃষ্টি হয়। তাক্‌ওয়া বলতে বুঝায় মানুষ খোদার সকল আমানত ও ঈমানের অঙ্গীকার ও তদ্রূপই সৃষ্টির সকল আমানত ও অঙ্গীকার-এর প্রতি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য রাখবে অর্থাৎ এর সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর দিকসমূহের প্রতি সাধ্যমত খেয়াল রাখবে" (বারাহীনে আহমদীয়া পরিশিষ্ট, পঞ্চম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫১,৫২)।

৩১ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
• কুরআন শরীফ	৪
• হাদীস শরীফ	৫
• অমৃতবাণী	৬
• জুমুআর খুতবা ঃ রোযা পালনের মাধ্যমে তাকওয়া এবং আল্লাহ্‌র নৈকট লাভ হয় এবং দোয়া কবুল হয় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) *অনুবাদ–মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী*	৭-১৩
• **জুমুআর খুতবা ঃ পোপ উপস্থাপিত বক্তব্য ও আহমদীয়া খলীফার প্রতিক্রিয়া** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) *অনুবাদ– মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান*	১৪-২০
• আদর্শ আহমদী নারীর মর্যাদা ও তার দায়-দায়িত্ব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) *অনুবাদ– মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী*	২৫-৩১
• **হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) চিঠি পত্র** *অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ*	৩২-৩৫
• **হুযূর (আইঃ)-এর অস্ট্রেলিয়া সফরের বিবরণ** *অনুবাদ ঃ কওসার আলি মোল্লা*	৩৬-৪০
• উকিল আ'লার দফতর থেকে *অনুবাদ ঃ বশির উদ্দিন আহমদ*	৪১
• আহমদীয়া বিরোধী সংবাদের প্রতিবাদ	৪২-৪৩
• আমি মুসলমান আমার ধর্ম ইসলাম *আলহাজ্জ এ.কে. রেজাউল করীম*	৪৪-৪৫
• হোমিওপ্যাথি : সদৃশ-বিধান চিকিৎসা *অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী*	৪৬
• প্রফেসার আব্দুল লতিফ এক বড়ে বুযুর্গ থে *মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল*	৪৭-৪৮
• ~~যাকাত ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়~~ *ডা. শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ*	৪৯-৫০
• অসুস্থ দুর্নীতি *মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী*	৫১-৫৩
• ইসলামের প্রচার ও প্রসার লাভ *হাসেম উল্লাহ সিকদার*	৫৪
• এমটিএ ডাইজেষ্ট *সংকলন : আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক*	৫৫
• রমযান মাস উপলক্ষ্যে সার্বিক তরবিয়তী কার্যক্রম	৫৬
• সংবাদ	৫৭-৫৮

প্রচ্ছদ ঃ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ও পোপের ছবি

সূরা ইউনুস-১০

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١١

১১। সেখানে তাদের ঘোষণা হবে, 'হে আল্লাহ্!১২৪১ তুমি পবিত্র' এবং সেখানে তাদের (পারস্পরিক) শুভেচ্ছা-সম্ভাষণ হবে সালাম (অর্থাৎ শান্তি)। আর তাদের শেষ ঘোষণা হবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক।'

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۭ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۗءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝١٢

১২। আর আল্লাহ্ যদি মানুষকে (তাদের) দুষ্কর্মের প্রতিফল তাদের সম্পদ ও মঙ্গল শীঘ্র চাওয়ার১২৪২ মত দ্রুত প্রদান করতেন তাহলে নিশ্চয় তাদের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ করে দেয়া হতো। তাই, যারা আমাদের সাক্ষাতের প্রত্যাশা রাখে না আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা অবস্থায় ছেড়ে দেই।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَاۗىِٕمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ۭ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٣

১৩। আর দুঃখ-কষ্ট মানুষকে যখন স্পর্শ করে তখন সে পাশ ফিরে শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়ে আমাদেরকে ডাকে। কিন্তু আমরা তার দুঃখ-কষ্টকে তার (কাছ) থেকে দূর করে দিলে সে এমনভাবে পাশ কাটিয়ে যায়, যে দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা লাঘবের জন্য সে যেন আমাদেরকে কখনও ডাকেইনি। এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে তাদের কৃত-কর্ম সুন্দর দেখান হয়।

১২৪১। আল্লাহ্তাআলার মহিমান্বিত প্রশংসা ও শোকরিয়া আদায় হবে স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণা থেকে, কারণ জান্নাতে মানুষের নিকট সকল কিছুরই সত্যতা যথার্থরূপে বাস্তবাকারে প্রকাশিত হবে এবং তারা বুঝতে পারবে আল্লাহ্তাআলার সকল কর্মই গভীর প্রজ্ঞামন্ডিত। এ চেতনা বা উপলব্ধিতে তারা সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিস্ময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চস্বরে বলে উঠবেঃ 'হে আল্লাহ্! তুমি পবিত্র।' এ আয়াত এটাও বুঝায় যে, মু'মিনের শেষ পরিণতি সুখ ও শান্তি। আল্লাহ্তাআলার মহিমা কীর্তনের মাধ্যমেই তারা তা প্রকাশ করে।

১২৪২। 'খায়ের' শব্দের এক অর্থ ধন-সম্পদ (লেইন)। এ অর্থে আয়াতের মর্ম হচ্ছে, অবিশ্বাসীদের ধন-সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্যে সকল কর্মশক্তির ব্যয় করে এবং আল্লাহ্তাআলাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। তাদের আচরণ বলে দেয়, অমঙ্গল তাদেরকে অতর্কিতে পাকড়াও করবে। কিন্তু আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে ধীর। তিনি যদি তাদেরকে প্রাপ্য শাস্তি দিতে ত্বরা করতেন তাহলে অনেক পূর্বেই তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হতো। যদি 'খায়ের' শব্দের অর্থ ভাল বা মঙ্গল করা হয়, তবে আয়াতের মর্ম দাঁড়ায়, মঙ্গল করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ যেরূপ শীঘ্র করেন, যদি অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি প্রদানে সেরূপ তাড়াহুড়া করতেন তাহলে তারা আরো অনেক পূর্বেই ধ্বংস প্রাপ্ত হতো।

হাদীস শরীফ

রোযা

عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهٗ حَدَّثَهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهٗ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ —رواه مسلم

অর্থাৎ হযরত আবূ আইয়্যুব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এবং পরবর্তীতে (ঈদের দিন বাদ দিয়ে) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখে সেক্ষেত্রে সে যেন গোটা বছরই রোযা রাখলো (মুসলিম)।

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও পূর্ণাঙ্গীণ শর্তাবলী সহকারে রমযানের রোযা রাখে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ রমযান একটি পবিত্র মাস। এ মাসের ইবাদত খোদার নিকট সবচে' প্রিয়। কারণ, নামায ও রোযার সমন্বয় মানুষের মধ্যে খোদার নৈকট্য লাভের এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। তা এভাবে যে, নামায আত্মাকে পবিত্র করে এবং রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। ফলশ্রুতিতে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি রোযা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার এক নতুন রাস্তায় পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টির ছায়াতলে চলে আসে। কুরআন বলে, রোযা তোমাদের মাঝে তাক্ওয়া অর্থাৎ খোদা-ভীতি সৃষ্টি করবে। এ তাক্ওয়া কিভাবে সৃষ্টি হবে? বস্তুত রোযা এমন ইবাদত যা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে খোদার সন্তুষ্টির জন্যে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ না রেখে কেউ রোযা রাখে তবে এটা রোযা নয় বরং অন্য কিছু। খোদা-ভীতির সৃষ্টি এভাবেই হয় যে, মানুষ খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের মন-মেজায ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খোদার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে তার অবাধ্য আত্মা নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ঐ সকল কর্ম হতে সে দূরে সরে পড়ে যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

হযরত রসূল করীম (সঃ) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযার কথা উল্লেখ করে এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের ৩০টি ও শাওয়ালের ৬টি মোট ৩৬টি রোযা যে রাখবে সে যেন সারাটা বছর রোযা রাখার সওয়াব পেল। এক হাদীসে আছে, এক রোযার দশটি সওয়াব। এভাবে ৩৬×১০ মোট ৩৬০ হয় অর্থাৎ ৩৬০ দিন রোযা।

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ পূর্ণ শর্তাবলীর সাথে রোযা পালন করে তবে তার পূর্বেকার সকল পাপ মাফ করে দেয়া হবে। এর অর্থ হলো, রমযান তাক্ওয়া সৃষ্টি করে থাকে। যদি কেউ রোযা পালনের মাধ্যমে তাক্ওয়া নিজের মাঝে সৃষ্টি করে নেয় ও তওবাতুন নাসূহ্ (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গীন তওবা দ্বারা নিজের সংশোধন করে নেয় আর কখনও পাপের দিকে ফিরে না তাকায়) করে, তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি খোদা দয়া পরবশ হয়ে তার গুনাহ্ মাফ করে দেন। রোযার মাস সংযমের মাস, সাধনার মাস। আসুন এ রমযানে আমরা চেষ্টা করি, সাধনা করি যেন আমাদের অবাধ্য আত্মা অর্থাৎ 'নফসে আম্মারা' প্রশান্তি-প্রাপ্ত আত্মাতে অর্থাৎ 'নফসে মুতমাইন্না'তে পরিণত হয়। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র রমযান মাসে এ সাধনা করার তৌফীক দিন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা– মাওলানা সালেহ্ আহমদ,
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

রোযার মাহাত্ম্য

✈ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রোযার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখেছেন, "অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করা ও আত্মশুদ্ধির জন্যে আবশ্যক। এতে দিব্য-দর্শন শক্তি (কাশ্‌ফী তাকত) বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না। যে অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ্য করা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর "ঐশীক্রোধ" (কহরে ইলাহী) আনয়ন করে। কিন্তু রোযাদারকে লক্ষ্য রাখতে হবে, রোযার অর্থ শুধু এটা নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকবে; বরং খোদার যিক্‌র অর্থাৎ তাঁর স্মরণে মশগুল থাকা উচিত। আঁ হযরত (সঃ) রমযান শরীফে অনেক বেশি ইবাদত করতেন। এ দিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি মনোনিবেশ (তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্) করা চাই। দূর্ভাগ্য ঐ ব্যক্তির, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্যে পরওয়া করে না। বাহ্যিক খাদ্য দ্বারা দৈহিক শক্তি লাভ হয়, একইভাবে আধ্যাত্মিক খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং তদ্বারা আত্মার শক্তিগুলো সতেজ হয়। খোদার নিকট সাফল্য চাও। কারণ, তিনি সামর্থ্য দিলেই সকল দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।"

✈ "কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয় বরং এর একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটা নিহিত আছে যে, মানুষ যতো কম খায়, ততই তার আত্মশুদ্ধি এবং কাশ্‌ফী তাকত বা দিব্য-দর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় এটাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারের সর্বদাই এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য। খোদাতাআলার যিক্‌র বা স্মরণের মধ্যেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব, রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যা আত্মার প্রশান্তির এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যই রোযা রাখে এবং আচার-অনুষ্ঠানের রোযা রাখে না তার উচিত, সে যেন সর্বদা হাম্‌দ (প্রশংসা কীর্তন), তস্‌বীহ্ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা) এবং তাহ্‌লীলের (আল্লাহ্‌র তৌহীদ ঘোষণা) মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্যের (আধ্যাত্মিক খাদ্যের) সৌভাগ্য লাভ হয়" (আল হাকাম, ১৭/১/১৯০৭)।

✈ "তৃতীয় বিষয়, যা ইসলামের মূল ভিত্তি, তাহল রোযা। রোযার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কেও মানুষ অনবহিত। প্রকৃত কথা এই যে, যে দেশে মানুষ যায় না এবং যে জগৎ সম্পর্কে সে অবহিত নয় সে এর অবস্থা কী বর্ণনা করবে? রোযা কেবল এটাই নয় যে, মানুষ এ দিনে ক্ষুধা ও পিপাসার্ত থাকে। বরং এর একটি তাৎপর্য ও এটার একটি প্রভাব আছে, যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায়। মানুষের প্রকৃতিতে এটা আছে যে, সে যত কম খায় ততই তার আত্মা পবিত্র হয় এবং 'কাশ্‌ফী শক্তি' (দিব্য-দর্শনের শক্তি) বৃদ্ধি লাভ করে। এতে খোদাতাআলার ইচ্ছা এটাই যে, একটি খাদ্য কম কর এবং অন্যটিকে বাড়াও" (মলফূযাত, নবম খন্ড পৃঃ ১২৩)।

✈ "সর্বদা রোযাদারের এ কথা দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, ক্ষুধার্ত থাকাই তার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উচিত সে খোদাতাআলার যিক্‌র-এ মগ্ন থাকবে যাতে দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্ মুখী হওয়া যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য এটাই যে মানুষ একটি রুটি ছেড়ে দিয়ে যা কেবল দেহ প্রতিপালন করে দ্বিতীয় রুটি লাভ করে যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ। যারা কেবল খোদার জন্য রোযা রাখে এবং নিছক রুসূম হিসেবে রাখে না, তাদের উচিত আল্লাহ্‌তাআলার 'হামদ' (প্রশংসা), 'তসবীহ্' (গুণ কীর্তন করা) ও তাহ্‌লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) পাঠে মগ্ন থাকা, যদ্দরুন অন্য খাদ্যও তারা পেয়ে যায়" (মলফুযাত, নবম খন্ড পৃঃ ১২৩)।

রোযা পালনের মাধ্যমে তাক্ওয়া এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয় এবং দোয়া কবুল হয়। রমযান মাসের সাথে কুরআন মজীদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তাই এ মাসে বেশী বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা ও দরসে কুরআন শোনা প্রয়োজন।

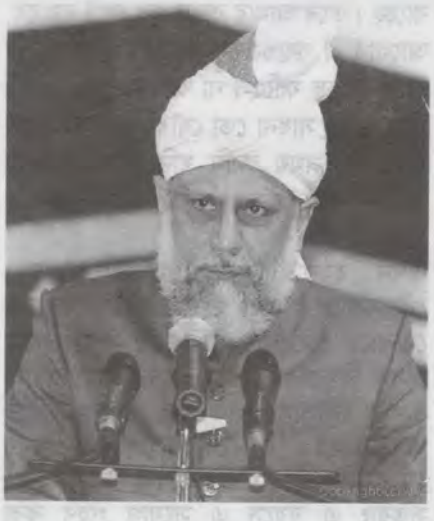

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস (আইঃ) কর্তৃক ৩১ অক্টোবর, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদে ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তা'আউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা বাকারার আয়াত ১৮৬, ১৮৭ তেলাওয়াত করে হুযুর (আইঃ) খুতবা প্রদান করেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٦﴾

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٧﴾

অনুবাদ–রমযান সেই মাস যাতে নাযেল করা হয়েছে কুরআন যা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকানের (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায়, সে যেন এতে রোযা রাখে; কিন্তু যে কেউ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তা হলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করতে হবে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

'এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন (বল), 'আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তারা ও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।'

আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে রমযান মাস আরম্ভ হয়ে গেছে। পাঁচটি রোযা অতিক্রম হয়েছে, বুঝা যায়নি। হাদীসে আছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন এটি অতি মহিমান্বিত মাস, বড় বরকতের মাস। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে কল্যাণমন্ডিত করার সুযোগ খুঁজেন যে, কিভাবে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে শয়তানের প্রভাবমুক্ত করে নিজের বান্দা করে নিবেন। যখনই তাঁর বান্দা তাঁর দিকে ধাবমান হয়, তাঁর অনুগ্রহের, ঈমানের দরজা উন্মুক্ত পায়। কিন্তু বিশেষ করে রমযান মাসে তো পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বান্দাদের উপর আল্লাহ্ দয়াবান হন। এটিও তাঁর বড় করুণা যে, যারা ইবাদত, নামায নওয়াফিল (নফল নামাযে) গাফিল থাকে, কুরআন পাঠের নির্দেশাবলীর উপর আমলে গাফিল হয়; তাদের জন্য নিয়ম মাফিক একটি মাস নির্ধারিত করে দিয়েছেন যেন ইবাদতগুযার, নামাযী, নফল নামায আদায়কারী, কুরআন পাঠে তার উপর আমল করতে মনোযোগীরা যখন এ মাসে আরো বেশি ইবাদত, নামায তেলাওয়াত করতে ব্যস্ত হবে তখন গাফিলরাও গাফিলতী ঝেড়ে ফেলে দ্রুত ইবাদতগুযার হওয়ার জন্য উৎসাহী হবে। এমন পরিবেশ সৃষ্টি হবে যে সেখানে অলস বা গাফিলরাও কিছু না কিছু করবে; পূর্ণকর্মে অংশগ্রহণ করবে। এভাবে তাদেরও অভ্যাস গড়ে উঠবে। অনেকেই চিরস্থায়ীভাবে পুন্যের উপর দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে যাবে এবং শয়তানের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, আমি এদের জন্য রহমতের ও ফযলের দরজা খুলে দিব। পথভ্রষ্টরা যখন পথ খুঁজে পায় তখন আল্লাহ্‌তাআলা খুব খুশী হন। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, পথভ্রষ্টরা যখন পথ খুঁজে পায় তখন আল্লাহ্ খুশী হন যেমন কোন মা তার হারানো সন্তানকে খুঁজে পেয়ে খুশী হয়, তার চেয়েও বেশি খুশী হন। রমযান মাসে আল্লাহ্‌তাআলা নিজ রহমতের সকল দরজাগুলো খুলে দেন। কুরআন খোদাতাআলার কিতাব, এটা খোদাতাআলার দিকে নিয়ে যায়। এ কিতাব পড়ে আমরা আল্লাহ্‌র সঠিক মারেফতের জ্ঞান লাভ করি। রমযান মাসের সাথে এ কিতাবের বিশেষ রূহানী সম্পর্ক আছে। তাই এ মাসে নামায ও অন্য সকল ইবাদতের সাথে এ কিতাব পাঠ করা এবং এর তফসীরের দরস শোনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। যেখানে যেখানে সম্ভব দরসের সুব্যবস্থা থাকা উচিত।

[প্রতিদিন এমটিএতে দরস প্রচার হয়ে থাকে।–অনুবাদক]

আমি এখন যে আয়াত পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন ঃ রমযান মাস সেই মাস যাতে নাযেল করা হয়েছে কুরআন যা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান [হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য কারী] বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায়, সে যেন এতে রোযা রাখে; কিন্তু যে কেউ অসুস্থ বা সফরে থাকে তাহলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

এবং যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন (বল), আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপার ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৬-৮৭)

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

রমযান সূর্য্যের তাপকে বলা হয়। রমযান মাসে যেহেতু মানুষ খানা-পিনা এবং আরো সব শারীরিক ভোগ উপভোগ থেকে নিজেকে বিরত রাখে ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লহ্‌র সকল আদেশ-নিষেধ পালনের জন্য দারুন উৎসাহিত থাকে, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক এ দুই উষ্ণতা ও উত্তাপ মিলে রমযান হয়েছে। অভিধানবিদরা বলেছেন যে, গ্রীষ্মকালে রমযান আরম্ভ হয়েছিল বলে রমযান নাম হয়েছে আমার মতে এ কথা ঠিক না। কারণ আরবদের জন্য এটি কোন বিষয় না। আধ্যাত্মিক বা রূহানী রমযান অর্থ রূহানী (ধর্মীয়) কাজে আগ্রহ এবং উত্তাপ। অবশ্যই ঐ গরমকে ও রমযান বলা হয় যাতে পাথর গরম হয়। (মলফুযাত, ১ম খন্ড, ৯০২ পৃষ্ঠা)

এখানে হযরত আকদাস (আঃ) বলেছেন যে, রমযান সূর্যের তাপকে বলে । যারা গরম দেশে বাস করে তারা জানে যে, সূর্য্যের তাপ কী জিনিস, কি অবস্থা হয়? আর যদি বাতাস বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কষ্ট অনেক বেড়ে যায়। গরমে শরীরে বিভিন্ন প্রকার দাগ দেখা দেয় (ঘামাছি ইত্যাদি) যাদের কাছে গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে না অর্থাৎ কোন উপকরণ থাকে না তারা শরীরে বিভিন্ন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করে, অনেক সময় তা অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায়। আজকাল অবশ্য ইউরোপীয় দেশগুলোতেও গরম খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। ছায়ার বাহিরে গেলে রোদের উত্তাপ কাহিল করে দেয়। আল্লাহ্‌ বলেছেন, তোমরা এ গরমের মধ্যে খানা-পিনা এবং

রমযান
সূর্য্যের তাপকে বলা হয়। রমযান মাসে যেহেতু মানুষ খানা-পিনা এবং আরো সব শারীরিক ভোগ উপভোগ থেকে নিজেকে বিরত রাখে ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লহ্‌র সকল আদেশ-নিষেধ পালনের জন্য দারুন উৎসাহিত থাকে, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক এ দুই উষ্ণতা ও উত্তাপ মিলে রমযান হয়েছে।

অন্যান্য শারীরিক আরামের জিনিস পরিত্যাগ করে আমার জন্য কষ্ট কর। যখন তোমরা আমার উদ্দেশ্যে কষ্ট করবে তখন তোমাদের মধ্যে পুর্ণ কর্মের জন্যও প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া উচিত। আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মান্য করার ইবাদত করার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি হওয়া উচিত। বলেছেন, শারীরিক ক্ষুধা ও পিপাসার জ্বালা এবং অভ্যন্তরের আল্লাহ্‌র ভালবাসার দহন একত্রিত হয়ে নাম হয়েছে রমযান।

বলেছেন রমযান মাসে কুরবআন নাযেল হয়েছে অর্থাৎ কত মহিমান্বিত এ মাস!আউলিয়ায়ে কেরাম লিখেছেন, হৃদয়কে নূরান্বিত করার জন্য খুব উপযুক্ত মাস। অনেক বেশি ঐশী নূরের বিকাশ ঘটে থাকে এ মাসে। নামায আত্মার পরিশুদ্ধি করে আর রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। আত্মার পরিশুদ্ধি অর্থ নফসে আম্মারার আক্রমণ থেকে দূরে থাকা বা এর থেকে দূরে অবস্থান করা। হৃদয় আলোকিত হওয়ার অর্থ কাশ্‌ফ বা ঐশী দর্শন বা দিব্য-দর্শনের দরজা উন্মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য লাভ করা। বলা হয়েছে "এ মাসে কুরআন নাযেল হয়েছে" এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রোযার পুরস্কার যে অনেক বড় পুরস্কার এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আনুগত্য অন্যান্য জটিলতা অনেক সময় মানুষকে এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দেয়।

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

আমার স্মরণ আছে যৌবনে একবার আমি স্বপ্নে দেখেছি রোযা পালন আহলে বায়াতের সুন্নাত। আমার পক্ষে আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন, 'সারমানু মিন্না আহলাল বায়তে'–সালমান অর্থাৎ সুলাহান অর্থ এর হাতে দু'টি আপোষ হবে। একটি অভ্যন্তরীণ অপরটি বর্হিজগতের এবং এ কাজ সে নিজ নম্রতার দ্বারা সম্পাদন করবে, তরবারির সাহায্যে না। তারপর আমি হযরত হোসেইন (রাঃ)-এর সমমনা নই যিনি যুদ্ধ করেছেন। বরং আমি হযরত হাসান (রাঃ)-এর সমমনা যিনি যুদ্ধ করেননি।' এতে আমি মনে করেছি যে, আমাকে রোযা রাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতঃপর আমি ক্রমাগত ছয় মাস রোযা রেখেছি। সে যুগে আমি দেখেছি যে, আলোর বড় বড় স্তম্ভ আকাশের দিকে যাচ্ছে। তবে আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয় যে, আলোর ঐ স্তম্ভগুলো মাটি থেকে আকাশের দিকে উঠেছ যাচ্ছিল না আমার বুক থেকে। কিন্তু এমন সাধনা তো যৌবন বয়সেই সম্ভব হয়। সে সময় আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে চার বছর পর্যন্ত রোযা রাখতে পারতাম।"

এখন হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) যৌবনকালের কথা উল্লেখ করে যুবকদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, বেশি বয়সে গিয়ে অসূখ বিসুখের কারণে অনেক সময় রোযা রাখার সৌভাগ্য লাভ করা থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। কিন্তু যৌবনকাল এমন সময় যে, সঠিকভাবে রোযা রাখা সম্ভব হয়। সুতরাং এ বয়সে এ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। হুযূর (আঃ) এ কথাও বলেছেন যে, তিনি যে রকম দীর্ঘকাল অনবরত রোযা রেখেছেন সবাই যেন এ চেষ্টা না করে। কারণ সকলের জন্য এমন করা সম্ভব হবে না। আমাকে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, সাহায্য সমর্থন করেছিলেন, শক্তি দিয়েছিলেন। তাই

আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু রমযানের রোযা তো রাখতেই হবে। কারণ প্রত্যেক সাবালক মুসলমানের উপর এটা ফরয, যদি সে অসুস্থ না হয়।

রোযার গুরুত্ব সম্পর্কে এবং এর ফলে যে পুরস্কার পাওয়া যায় সে সম্পর্কে কতিপয় হাদীস পেশ করছি।

রেওয়ায়াত আছে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেনঃ

প্রত্যেক জিনিসের জন্য নির্দিষ্ট দরজা থাকে, ইবাদতের দরজা রোযা। (জামেউস সাগীর)

তারপর হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলছেন, রোযা ঢাল স্বরূপ এবং আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি নিরাপদ দূর্গ।" অর্থাৎ আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাবার নিরাপদ আশ্রয়স্থল (মুসনাদ আহমদ)।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেছেন, আমরা হযরত ওমর (রাঃ) নিকট বসেছিলাম হযরত ওমর জিজ্ঞাসা করলেন, ফেৎনা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্পর্কে তোমাদের কাছে আঁ হযরত (সঃ)-এর দেয়া কোন বক্তব্য আছে?' আমি বললাম, আঁ হযরত (সঃ) যা বলেছিলেন আমার তা হুবহু মনে আছে। হযরত ওমর বললেন, 'তুমি কথা বলার ব্যাপারে খুব সাহস রাখ। আমি বললাম, মানুষ তার ঘর-সংসার, ধন-সম্পদ, সন্তানাদী অথবা প্রতিবেশির পক্ষ থেকে যে সব ফেৎনার সম্মুখীন হয়, নামায, রোযা, সদকা, ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার নির্দেশ পালনের মাধ্যমে ঐ সব ফেৎনার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। (বুখারী)

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ নিশ্চয় জান্নাতে বালাখানা থাকবে.... যার ভেতরের সবকিছু বাইরে থেকে দেখা যাবে। একজন বেদুঈন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ঐ বালাখানা কাদের জন্য হবে? আঁ হযরত (সঃ) বলেন যারা মিষ্টভাষী হবে, অভাবীদের আহার করাবে, নিয়মিত রোযা পালনকারী হবে, রাতের গভীরে যখন মানুষ নিদ্রামগ্ন থাকে তখন যারা উঠে নামায পড়ে।" (তিরমিযী)

এ সমস্ত হাদীসে রোযার ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রোযা কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম না। বরং সেই সাথে সকল মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক, সকল প্রকার পুণ্য কর্মে অংশ নিতে হবে। গরীবদের সাহায্য করতে হবে। তাদের অভাব পূরণ করতে হবে। ফরয নামায তো বটেই বরং নফল নামাযেরও উদ্যোগ নিতে হবে। এ সমস্ত কিছু করে সাথে রোযা রাখতে হবে। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জায়েয বস্তু খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে এসব করতে হবে। যদি তোমরা শরীয়তের সমস্ত আদেশ-নিষেধ মেনে চল তাহলে, সন্তানদের পক্ষ থেকে, ব্যবসা বানিজ্যের দিক থেকে, প্রতিবেশীদের দিক থেকে ঝগড়া ফাসাদ ইত্যাদি সমস্যাবলীর বিপরীতে তোমার এ সমস্ত পূণ্যকর্মসমূহ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কাজ করবে।

আল্লাহ্‌তাআলা রোযাদারের মুখের গন্ধকে এজন্য পছন্দ করেন যে, তাঁর বান্দা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে রোযা রাখতে বাধ্য করেছে এবং ইবাদতে রত হয়েছে। ফলে আল্লাহ্ তাঁর এমন বান্দাকে খুব পছন্দ করেন। এমন বান্দাদের জন্য বিশেষ রহমত ও ফযলের বাতাস প্রবাহিত করেন। ইহজগতেও তাকে নিজের আশ্রয়ে রাখেন এবং পরকালেও জান্নাতের উত্তরাধিকারী করেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, হযরত নবী (সঃ) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন ঃ "রোযা আমার জন্য অতএব, আমি নিজেই এর পুরস্কার হয়ে যাই।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন হয়ে যায়। রোযা যদি সকল শর্ত পূরণ করে রাখা হয় তাহলে এ রোযা আমার বান্দা আমার খাতিরে রাখে, নিজের জায়েয অধিকার থেকে নিজকে বিরত রাখে, (খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি) বলা হয়েছে রোযা গোনাহ্‌র বিপরীতে রোযাদারদের ঢাল স্বরূপ। রোযাদারদের জন্য দু'টি খুশী অবধারিত আছে। এ খুশী তো ঐ সময় যখন রোযাদার আল্লাহ্‌র ফযলে ইফতার করে। এ খুশী সে ইহকালেই লাভ করে। আর একটি খুশী পরকালে লাভ করবে যখন সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তার প্রভু তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আঁ হযরত (সঃ) আরো বলেছেন যে, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে কস্তুরীর সুগন্ধের চেয়েও পছন্দনীয়" (বোখারী, কিতাবুত তওহীদ)।

হযরত আবূ মাসুদ গাফফারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি তখন রমযান মাস ছিল, হুযূর (সঃ) বলেছিলেন, যদি মানুষ রমযানের মর্যাদা, ফযিলত সম্পর্কে জানত তাহলে আমার উম্মতের সবাই আকাঙ্খা করত যে সারা বছরটাই যেন রমযান হয়ে থাকে। একথা শুনে বনী খুজাআ গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি রমযানের ফযিলত সম্পর্কে বলুন। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত রমযানের জন্য প্রস্তুত করা হয়। রমযানের প্রথম দিন আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র আরশের নিচে বায়ু প্রবাহ শুরু হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌তাআলা রোযাদারের মুখের গন্ধকে এজন্য পছন্দ করেন যে, তাঁর বান্দা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে রোযা রাখতে বাধ্য করেছে এবং ইবাদতে রত হয়েছে। ফলে আল্লাহ্ তাঁর এমন বান্দাকে খুব পছন্দ করেন। এমন বান্দাদের জন্য বিশেষ রহমত ও ফযলের বাতাস প্রবাহিত করেন। ইহজগতেও তাকে নিজের আশ্রয়ে রাখেন এবং পরকালেও জান্নাতের উত্তরাধিকারী করেন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আমরা যেন বুঝতে পারি এবং সঠিক অর্থে রোযা পালন করে রমযান মাস উদযাপন করতে পারি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, মানুষ রোযা পালনে অলস্য প্রদর্শন করে। নামাযের কথাও উপরে উল্লেখ করেছি। তারপর রোযার ইবাদত। দুঃখের বিষয় এই

যে, এ যুগে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়েও এ সমস্ত ইবাদতের মধ্যে পরিবর্তন করতে চায়। তারা মন্দ তারা আল্লাহ্‌র হিকমত (প্রজ্ঞা) সম্পর্কে অবহিত না। নিজ নফ্‌সের (আত্মা) সংশোধনের জন্য এমন ইবাদত একান্তই আবশ্যক। এরা যে সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না সে সম্পর্কে অযথা অনধিকার চর্চা করে। যে দেশ তারা ভ্রমণ করেনি সে দেশের সংস্কারের মিথ্যা প্রস্তাব উপস্থাপন করে। তাদের জীবন কেটেছে সাংসারিক ঝামেলার মধ্য দিয়ে। ধর্মীয় জগতের কোন খবরই রাখে না। অল্প খাদ্য গ্রহণ, অভুক্ত থেকে কষ্ট করা নফসের সংশোধনের জন্য খুবই জরুরী। এর মাধ্যমেই দিব্য-দর্শনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মানুষ কেবল রুটি খেয়ে জীবন ধারণ করে না। পরকালের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়া নিজের উপর আল্লাহ্‌র গযব নাযেল করারই অনুরূপ। কিন্তু রোযাদারকে স্মরণ রাখতে হবে যে, রোযা অর্থ কেবল অভুক্ত থেকে দিন কাটানো নয়। বরং আল্লাহ্‌র স্মরণে খুব মগ্ন হওয়া আবশ্যক। হতভাগ্য ঐ ব্যক্তি যে শারীরিক রুটি তো উপভোগ করে কিন্তু রূহানী রুটির (খাদ্য) প্রতি নজর দেয় না। শারীরিক রুটি শরীরে শক্তি লাভ হয়, রূহানী রুটির সাহায্যে রূহ্ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রূহানী শক্তিগুলো বৃদ্ধি পায়। খোদার থেকে কল্যাণ প্রাপ্তি আবশ্যক। যার প্রত্যেক দরজা কেবল তাঁরই দয়ায় উন্মুক্ত হয়।" (তাকরীর জলসা সালানা ১৯০৩ইং পৃঃ ২০-২১)

তারপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, কুরআন মজীদ মানব জাতির হেদায়াতের জন্য নাযেল করা হয়েছে। এবং এতে বিস্তারিত হেদায়াত বর্ণিত হয়েছে। সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"এক অর্থ এই যে, এই কিতাবকে যেন গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়া হয়, বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। এর নির্দেশাবলী সমূহকে নিজের উপর কার্যকর করতে সচেষ্ট হওয়া চাই। তাহলে আল্লাহ্‌র মা'রেফত লাভ হবে। এবং আল্লাহ্ তাকে নিজ প্রিয়ভাজন বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করে দিবেন।

হযরত আকদাস (আঃ) বলেছেন ঃ

এ আয়াতে রমযানের তিনটি গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত এই যে, যে সকল কথা মানুষ জানত না সে সব কথা জানান হয়েছে এবং দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ প্রথম যুগের কিতাবগুলোতে যেমন বিষয় সংক্ষেপে বলা হয়েছে। তৃতীয়তঃ যে সমস্ত বিষয়ে বিতর্ক ও

রোযা
অর্থ কেবল অভুক্ত থেকে দিন কাটানো নয়। বরং আল্লাহ্‌র স্মরণে খুব মগ্ন হওয়া আবশ্যক। হতভাগ্য ঐ ব্যক্তি যে শারীরিক রুটি তো উপভোগ করে কিন্তু রূহানী রুটির (খাদ্য) প্রতি নজর দেয় না। শারীরিক রুটি শরীরে শক্তি লাভ হয়, রূহানী রুটির সাহায্যে রূহ্ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রূহানী শক্তিগুলো বৃদ্ধি পায়। খোদার থেকে কল্যাণ প্রাপ্তি আবশ্যক। যার প্রত্যেক দরজা কেবল তাঁরই দয়ায় উন্মুক্ত হয়।"

বিবাদ সৃষ্টি হয়ে গেছে সেসব বিষয়ে সঠিক এবং বেঠিক এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে।' (তফসীর হযরত আকদাস (আঃ) ১ম খন্ড, পৃঃ ৬৪৫)

সুতরাং এখান থেকে জানা গেল যে, উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম যুগে নবীগণ ছিলেন নিজ নিজ অঞ্চলের জন্য, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ) সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। এতএব, যে সমস্ত বিষয় প্রথম যুগে বলা তা কুরআন শরীফে বলে দেয়া হয়েছে এবং আঁ হযরত (সঃ)-এর উপর সম্পূর্ণ কিতাব বা শরীয়ত নাযেল করা হয়েছে এবং সকল প্রকার হেদায়াত যা মন্দ জাতির জন্য আবশ্যক ছিল তা সবই এতে বর্ণিত হয়েছে। তারপর ঐ সমস্ত নির্দেশাবলী যা খুব স্পষ্ট ছিল না, সুনির্দিষ্ট ছিল না; যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ বিষয় সঠিকভাবে মানুষের জানা ছিল না সেগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে যুক্তি প্রমাণসহ সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব, যার যতটুকু সামর্থ আছে তার ততটুকু মেধাশক্তি ব্যয় করে মনোযোগ সহকারে কুরআন বেশি বেশি পড়া উচিত এবং এর চমৎকার শিক্ষাগুলোকে নিজ জীবনে কার্যকর করা উচিত। এতে অংশগ্রহণ করা উচিত। মোটকথা রমযান ও কুরআন এর মধ্যে একটা গভীর সাদৃশ্যতা রয়েছে। হাদীসে আছে জীব্রাইল প্রত্যেক রমযানে কুরআন শরীফ যতটা তখন পর্যন্ত নাযেল হয়েছিল সবটুকু পুনরায় আঁ হযরত (সঃ) -কে শোনাতেন। এ জন্যও এ মাসে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা, অর্থ বুঝতে চেষ্টা, কুরআনের দরসে শামিল হওয়া উচিত যেন কুরআনের অর্থ বুঝতে সাহায্য লাভ হয়, আস্তে আস্তে বুঝবার যোগ্যতা লাভ হতে থাকে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয়। এ আয়াতে পরবর্তী অংশে কোন কোন অবস্থায় রোযা রাখা উচিত না সে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে গত জুমুআর খুতবায় বলা হয়েছে।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমার বান্দাদের বলে দাও যে, আমি তাদের খুবই কাছে আছি। এখন দোয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যারা দোয়া করে (আমার কাছে মোনাজাত করে) আমি তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি যদি তোমরা রোযার পদ্ধতি জেনে দোয়া কর আমাকে খুব কাছে পাবে। এ আয়াত রোযার নির্দেশের আয়াতের পাশে রাখা হয়েছে। তারপরের আয়াতেও রোযা সম্পর্কে নির্দেশাবলী আছে। আল্লাহ্ বলেছেন, আমি তাদের প্রার্থনার উত্তর দিই যারা আমার কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু তোমাদের জন্য আমার নির্দেশসমূহ মান্য করা ফরয। পুণ্যকর্ম কর, মন্দ কাজ করো না। এটা তো হয় না যে, তোমরা সাংসারিক, জাগতিক কথা ও কাজে ব্যস্ত থাকবে, আমার কথা স্মরণও করবে না। যখন কোন বিপদে পড় তখন এসে আমাকে ডাকতে আরম্ভ কর। একথা যদিও ঠিক যে, এমন লোকের দোয়াও তিনি শোনেন যে বিপদে পড়েই ডাকতে শুরু করেছে, তাকে সাহায্য করেন। কিন্তু সে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর আবার আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়।

অবাধ্য হয়ে যায়। এমন আচরণ জাগতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও চলে না। আল্লাহ্ বলেছেন, আমি তোমাদের খুবই কাছে। আমি তোমাদের দোয়া শুনি যারা আমার নিকটের এবং আমার সাথে যারা সম্পর্ক রাখে। যারা কেবল জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই ছুটে আসে না।

এখন তোমরা যখন রোযা পালন করছ, আমার আদেশ মান্য করে চলছ, মন্দ কাজ থেকে নিজেকে দুরে রাখছ। পুর্ণ্যের কাজে একে অপরকে নসিহত করছ, নিয়মিত নামায আদায় করছ, নফল নামায বেশি বেশি আদায় করছ। অতএব, আমিও তোমাদের দোয়া শুনব। তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। আমি তো তোমাদের অপেক্ষা করি যে, আমার কোন বান্দা যে আমার নির্দেশাবলী মান্য করে চলে এবং সে আমার কাছে দোয়া করে এবং সে কেবল আমারই বান্দা।

অতএব, আজ যখন তোমরা কেবল আমাকে স্মরণ করে দোয়া করছ আমার উপর ঈমান রাখছ, আমার বান্দাদের অধিকার তাদেরকে দিচ্ছ; রমযান মাসে গরীবদের রোযা রাখতে ইফতার করতে সাহায্য করছ, ঝগড়া ফাসাদ থেকে দূরে থাকছ, প্রথমেই অনেককে ক্ষমা করছ; প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত থাকছ; কারণ ঈমানের পরিপক্কতার জন্য আল্লাহ্র সকল সিফাত (গুণাবলী) সমূহের উপর কামেল ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। অতএব, আমার সিফাত সমূহকে সর্বদা চোখের সামনে রাখছ, নিজেদের যোগ্যতাসমূহকে তদানুসারে বিকশিত করতে চেষ্টা করছ, হে আমার বান্দারা আমি তোমাদের কাছেই আছি। আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনছি, এখন আর তোমাদের কোন দুশ্চিন্তা করা উচিত না, এ মাসে আমার রহমতের দুয়ার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছি।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, "তোমাদের উচিত আমার আদেশ মেনে চলা এবং আমার উপর বিশ্বাস করা" অর্থাৎ আমি যে বললাম, আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শুনি এতে তোমাদের এ কথা মনে করা উচিত হবে না যে, আমি তোমাদের প্রত্যেক দোয়াই কবুল করব। আমি যাদের দোয়া শুনি তাদের জন্য দু'টি শর্ত থাকে। প্রথম আমি তাদের দোয়া শুনি যারা আমার আদেশ মেনে চলে। দ্বিতীয় আমি তাদের দোয়া শুনি যারা আমার উপর দৃঢ় ঈমান রাখে,আমার সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে না। যদি দোয়াকারীর অন্তরে আমার শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাস না থাকে তাহলে আমি তার দোয়া কেন শুনব? সুতরাং দোয়ার কবুলিয়তের জন্য দু'টি শর্ত আছে। যে সমস্ত দোয়া এ শর্তদ্বয় পূরণ করে করা হয় সে সমস্ত দোয়া কবুল হতে পারে। এজন্যই এখানে বলা হয়েছে 'আদদায়ে'-এর অর্থ একজন বিশেষ প্রার্থনাকারী।

অতএব রমযান মাসের সাথে দোয়া কবুলের গভীর সম্পর্ক। এ মাসে যারা দোয়া করবে তাদের জন্য আল্লাহ্তাআলা (আমি তোমাদের খুব কাছে) কাছে বা নিকটে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যদি তিনি নিকটে থেকেও তাঁকে না পাওয়া যায় তাহলে আর কবে পাওয়া যাবে?

পরে বলা হয়েছে বিশেষ প্রার্থনাকারী কে? যে আমার আদেশ মান্য করে, আমার উপর বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ তার দোয়া যেন আমার শর্তসমূহের মধ্যে হয়। জায়েয কথা যেন হয়, নাজায়েয প্রার্থনা যেন না করা হয়। চারিত্রিক গুণাবলী নিয়মাবলীর অন্তর্গত যেন হয়, সুন্নতের বাইরে যেন না হয়। যদি কেউ এমন দোয়া করে তাহলে আমি কবুল করি। কিন্তু যদি কেউ বলে যে, হে আল্লাহ্! আমার অমুক আপনজন মারা গেছে, তাকে তুমি জীবিত করে দাও। এ দোয়া তো কুরআনের বিরুদ্ধে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শিক্ষার বিরুদ্ধে। যে ব্যক্তি কুরআনও মানল না, আঁ হযরত (সঃ)-এর কথাও শুনল না তার কাথা আল্লাহ্ কেন শুনবেন? সুতরাং আয়াতের অংশে, "সে যেন আমার আদেশ মান্য করে এবং আমার উপর ঈমান রাখে যেন তারা হেদায়াত পায়।"

আল্লাহ্ বলেছেন, তোমাদের উচিত তোমরা আমার আদেশ মেনে চল এবং আমার উপর অবিচল বিশ্বাস রাখ। যদি আমার উপর বিশ্বাসই না থাকে তাহলে আমি কি করে তোমার দোয়া শুনি?

অতএব, দোয়া কবুলের জন্য দু'টি শর্ত আছে। প্রথম, "তারা যেন আমার আদেশ মান্য করে।" দ্বিতীয়, তারা যেন আমার উপর ঈমান রাখে।" যারা এ শর্তগুলো পূরণ করে না তারা ধার্মিক না, তারা আমার আদেশ মেনে চলে না, তাই আমিও তাদের জন্য প্রতিশ্রুতি দেই না যে, আমি তাদের দোয়া শুনব। হ্যাঁ আমি অনেক সময় তাদের দোয়াও শুনি। কিন্তু এ নিয়মানুসারে তাদের দোয়া শুনি না। যে ব্যক্তি এ শর্তগুলো পালন করে এবং দোয়াও করে তার প্রত্যেক দোয়া শুনি।" (তফসীর কবীর,২য় খন্ড, পৃঃ ৪০৫)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) আরো বলেন, অতএব রমযান মাসের সাথে দোয়া কবুলের গভীর সম্পর্ক। এ মাসে যারা দোয়া করবে তাদের জন্য আল্লাহ্তাআলা (আমি তোমাদের খুব কাছে) কাছে বা নিকটে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যদি তিনি নিকটে থেকেও তাঁকে না পাওয়া যায় তাহলে আর কবে পাওয়া যাবে? যখন বান্দা তাঁকে খুব জোরালোভাবে ধরে বলে এবং কার্যক্রম দিয়ে প্রমাণ করে যে, এরপর সে আর কখনও আল্লাহ্র চৌকাঠ ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না, তখন আল্লাহ্র রহমতের দরজাগুলো সব খুলে দেয়া হয়। আমি তোমার খুব কাছে–এ কণ্ঠস্বর সে শুনতে থাকে এবং এর একমাত্র অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তার সাথে আছেন। যখন কোন মানুষ এ অবস্থা লাভ করে বুঝে নিতে হবে যে, সে আল্লাহ্কে পেয়ে গেছে।"

হাদীসে হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়াত আছে আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ "রমযান মাসে আল্লাহ্র যিক্র যারা করে তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হয়, এ মাসে আল্লাহ্র কাছে চেয়ে কেউ বঞ্চিত থাকে না।"

আঁ হযরত (সঃ) এ কথাও বলেছেন যে, রোযাদার ব্যক্তি ইফতারী করার সময় যা দোয়া করে তা কখনই না মঞ্জুর হয় না। (ইবনে মাজাহ)

খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন ঃ

"যদি মানুষে জিজ্ঞেস করে যে, রোযার দ্বারা

কিভাবে নৈকট্য লাভ হয়!' তুমি বল, আমি খুব নিকটে এবং এ মাসে যারা দোয়া করে তাদের দোয়া শুনে থাকি। তাদের উচিত তারা যেন আগের থেকে আমার আদেশ নিষেধ মেনে চলে যা আমি আদেশ দিয়ে রেখেছি। আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যেন সে উদ্দেশ্যে লাভে সফল হতে পারে এবং এভাবে সে অনেক উন্নতি করবে।" (আলহাকাম, ১৭ নভেম্বর, ১৯০৭ ইং পৃঃ ৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) আরো বলেছেন ঃ "রোযা যেমন তাক্ওয়া লাভের মাধ্যম তেমনই আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ও মাধ্যম। তাইতো রমযানের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্তাআলা বলেছেন ঃ (সুরা বাকারা ঃ ১৮৭) এ আয়াতে রমযানের বরকত সম্পর্কে নাযেল হয়েছে। এখান থেকে রমযান মাসের সম্মান এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে জানা জানা যায় যে, যদি কেউ এ মাসে দোয়া করে তাহলে আমি কবুল করব। কিন্তু তার উচিত হবে আমার কথা মেনে চলা এবং মান্য করা। মানুষ যত বেশি আল্লাহ্র আদেশ পালনে শক্তি ব্যয় করে আল্লাহ্ও তত বেশি তার দোয়া কবুল করেন। তারপর আয়াতে শেষে যে বলা হয়েছে, "যেন তারা হেদায়াত পায়"-এর থেকে জানা যায় যে, হেদায়াত লাভ করা ও এ মাসের বরকত। এ মাসে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান, তাঁর নির্দেশাবলীর আনুগত্য এবং দোয়ার মাধ্যমে হেদায়াত লাভ হয়। আরো কথা রয়েছে। যদ্বারা আল্লাহ্ নৈকট্য লাভ হয়। [আল্ হাকাম, ২৪ জানুয়ারী, ১৯০৪ইং পৃষ্ঠা ১২]

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"রমযান মাস বড় কল্যাণমন্ডিত মাস, দোয়ার মাস।" [আল্ হাকাম, ২৪ জানুয়ারী, ১৯০১ইং]

তারপর আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আরো বলেছেন,

"যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ কি? তখন এর উত্তর এই যে, 'আমি খুবই নিকটে আছি।' অর্থাৎ বড় কোন যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন নাই। আমার অস্তিত্বের প্রমাণ খুব সহজে পাওয়া যেতে পারে। আর সে দলিল এই যে, যখন কেউ আমাকে ডাকে বা দোয়া করে, তখন আমি তার দোয়া শুনি এবং আমি আমার বাণী নাযেল করে তাকে শুভ সংবাদ ও দিয়ে দেই যাতে করে আমার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং আমার শক্তিশালী হওয়ার প্রমাণ ও সে লাভ করে। কিন্তু তার উচিত সে নিজের মধ্যে তাক্ওয়া বা খোদাভীতি সৃষ্টি করে যাতে আমি তার দোয়া শুনি। তাছাড়া সে যেন আমার উপর ঈমান রাখে। পুরোপুরি ঐশী গভীর জ্ঞান বা মারেফত লাভের পূর্বেও সে আমার সম্পর্কে ঈমান রেখে ঘোষণা করে যে আমি আছি এবং সকল প্রকার শক্তি ঈমান ও ক্ষমতা আমি রাখি। কারণ যে ব্যক্তি ঈমান রাখে তাকেই গভীর তত্ত্ব-জ্ঞান বা মারেফত দান করা হয়।'(আইয়ামে সুলেহ্ রূহানী খাযায়েন; ১৪ খন্ড; ২৬০পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্তাআলাকে খুব বেশি বেশি স্মরণ কর, এতটা যেন মানুষ বলাবলি করে যে, এ ব্যক্তির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সুতরাং এটা হচ্ছে আল্লাহ্কে স্মরণ করার নিয়ম।

হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্তাআলাকে খুব বেশি বেশি স্মরণ কর, এতটা যেন মানুষ বলাবলি করে যে, এ ব্যক্তির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সুতরাং এটা হচ্ছে আল্লাহ্কে স্মরণ করার নিয়ম।

আঁ হযরত (সঃ) আরো বলেছেন ঃ রমযান মাসের প্রত্যক রাতে আল্লহ্তাআলা একজন আহ্বানকারী ফেরেশ্তাকে পাঠান, যিনি এসে ঘোষণা দেন, হে মঙ্গলাকাঙ্খী! সামনে এগিয়ে চল। সামনে এগিয়ে চল। কেউ এমন আছেন কি যে দোয়া করে তার দোয়া যেন কবুল করা হয়? কেউ কি ক্ষমা প্রার্থনা করছে যে তাকে যেন ক্ষমা করা হয়? কেউ কি তওবা করছে যে, তার তওবা যেন কবুল করা হয়?" (কনযুল উম্মাল)

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ রাতের অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ যখন অতিবাহিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ্তাআলা নিচের আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন, কেউ কি আমার কাছে কিছু চায় তাকে দেয়া যায়? কেউ কি কোন দোয়া করে যে তার দোয়া কবুল করা হয়? কেউ কি তার পাপের ক্ষমা চায় যেন তাকে ক্ষমা করা হয়? এমন অবস্থা ফযরের পূর্ব পর্যন্ত বিরাজমান থাকে। সুতরাং তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়ানো খুবই প্রয়োজন। কেননা সেহরীতে খেতে কেন উঠবেন আর একটু সময় হাতে রেখে উঠতে হবে যেন কিছু নফল নামাযও পড়া যায়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্তাআলা বলেছেন,আমি বান্দাদের আশানুরূপ তাদের সাথে আচরণ করি। যদি বান্দা আমাকে স্মরণ করে আমি তখনি তার সাথে হই। যদি সে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি এবং যদি সে কোন মাহফিলে আমার যিক্র করে তাহলে আমিও আমার ঐ বান্দার উল্লেখ আরো ভাল মাহফিলে করব। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাব। যদি সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাব। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে;দৌড়ে যাব।" (তিরমিযী, আবওয়াবুদ্ দাওয়াত)

হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্তাআলা বড় ক্ষমাশীল, বড়ই ভদ্রতা রক্ষাকারী এবং বড় দানশীল। বান্দা যখন তাঁর সামনে হাত তুলে (কিছু চায়) তখন বান্দাকে খালি হাতে ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।" অর্থাৎ আন্তরিকতার সাথে চাওয়া দোয়া তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না বরং কবুল করেন। (তিরমিযী কিতাবুদ দাওয়াত)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ দোয়ার মধ্যে কবুলিয়তের উপাদান (গ্রহণযোগ্যতা) তখন সৃষ্টি হয় যখন দোয়াকারীর হৃদয় ব্যথায় জর্জরিত হয়ে চরম অবস্থায় চলে যায়। যখন হৃদয় বিগলিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে সেই দোয়ার কবুলিয়তের আলামত (চিহ্ন) প্রকাশ পায়। এবং উপকরণ সৃষ্টি হয়। প্রথমে তো

আকাশে এর উপকরণ প্রস্তুত করা হয় তারপর পৃথিবীতে তা প্রকাশ পায়। এটা কোন ছোট খাট কথা নয়, অত্যন্ত বড় সত্য কথা। বরং প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, যদি কেউ আল্লাহ্‌র জ্যোতির বিকাশ প্রত্যক্ষ করতে চায় তার দোয়া করা উচিত।" (তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১ম খন্ড, ৬৫৫ পৃষ্ঠা)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

'দোয়ার উদাহরণ একটি সুপেয় পানির ঝর্ণার মত। যার পাড়ে একজন মোমেন বসে আছে যখন মন চায় সেখান থেকে পানি পান করতে পারে। পানির মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না। ঠিক তেমন মোমেনের জন্য দোয়া পানি স্বরূপ। এছাড়া সে বাঁচতে পারে না। দোয়ার সঠিক স্থান নামায। অর্থাৎ দোয়া করার সঠিক স্থান নামায। নামাযের মধ্যে দোয়ার সময় মোমেন যে স্বাদ লাভ করে একজন প্রচন্ড বিলাসী ব্যক্তি কোন পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে এত আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। দোয়ার মাধ্যমে সবচেয়ে বড় যা লাভ হয় তা হল আল্লাহ্‌র নৈকট্য। একজন মানুষ দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছাকাছি চলে যায় এবং তিনি তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে যান। মোমেন যখন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দোয়ার মাঝে পুরোপুরি বিমোহিত হয়ে যায়, এমন কি পরিবেশের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন আল্লাহ্‌র কৃপা তার জন্য সৃষ্টি হয় এবং তিনি তার অভিভাবক হয়ে যান। [তার সমস্ত কাজ আল্লাহ্ নিজ হাতে নিয়ে নেন] মানুষ যদি নিজ জীবন সম্পর্কে চিন্তা করে তাহলে শুনতে পারবে যে আল্লাহ্ যদি কারো অভিভাবক না হন তাবে তার জীবন বড় দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।" [তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১ম খন্ড, পৃঃ ৬৫৬]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ যদি আমার বান্দারা আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, আমার অস্তিত্বে প্রমাণ কি? [আল্লাহ্ সম্পর্কে হযরত (আঃ) বলেছেন] এর উত্তর এই যে, আমি খুব কাছেই আছি। আমি তো তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি যে আমাকে ডাকে। আমাকে যদি কেউ ডাকে আমি ডাক শুনি এবং তার সাথে কথা বলি। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে এমন বানাও যেন আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে পারি এবং আমার ঈমান আন যেন তোমরা আমার পথ পাও।" [লেকচার লাহোর, পৃঃ ১৩]

এবার একটি দোয়া বলছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জনাব মোহাম্মদ খান সাহেবকে এ দোয়া করে বলছিলেন।

"হে রাব্বুল আলামীন! আমি তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শেষ করতে পারব না। তুমি বড় দয়ালু এবং বড় দানশীল। তোমার সীমাহীন অনুগ্রহ আমার উপর, তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর যেন আমি

'দোয়ার উদাহরণ একটি সুপেয় পানির ঝর্ণার মত। যার পাড়ে একজন মোমেন বসে আছে যখন মন চায় সেখান থেকে পানি পান করতে পারে। পানির মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না। ঠিক তেমন মোমেনের জন্য দোয়া পানি স্বরূপ।

ধ্বংস হয়ে না যাই। তুমি আমার অন্তরে তোমার ভালবাসা ঢেলে দাও যেন আমি জীবন লাভ করি। আমার দূর্বলতাসমূহকে ঢেঁকে রাখ। আমার দ্বারা এমন কর্ম করাও যাতে তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট হও। তোমার মহামান্বিত মুখের কাছে আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি যেন আমার উপর তোমার গযব আপতিত না হয়। তুমি দয়া কর, তুমি দয়া কর, দয়া কর, ইহকাল ও পরকালের আযাব থেকে আমাকে বাঁচাও। কারণ প্রত্যেক অনুগ্রহ কেবল তোমারই হাতে (আমীন)।

হযরত নবী করীম (সঃ) হুজ্জাতুল বিদাআ (বিদায় হজ্জ)-এর সময় আরাফাতের ময়দানে যে দোয়া করেছিলেন তাতে ছিল ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি আমার কথা শুনতে পাও, আমার অন্তরের অবস্থা দেখতে পাও, আমার গোপন ব্যাপারগুলো তুমি জান, আমার প্রকাশ্য বিষয়গুলো তুমি জান, আমর কোন কিছুই তোমার অগোচর নেই। আমি একজন বিধ্বস্ত অবস্থায় ফকীর, অভাবগ্রস্থ, তোমার সাহায্য ও তোমার আশ্রয় প্রার্থী, আশংকাগ্রস্থ, আমার পাপসমূহ স্বীকার করছি, দোষ স্বীকার করছি, আমি তোমার কাছে বিনীত মিসকিনের মত ভিক্ষা চাচ্ছি। তোমার সামনে একজন পাপী, অপমানিতের মত কাঁদছি। অন্ধের মত, কানার মত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দোয়া প্রার্থী হয়েছি, আমার মাথা তোমার সামনে নত হয়ে ঝুকে পড়েছে, আমার চোখের অশ্রু ঝরছে তোমার সামনে। আমার দেহ তোমার সামনে পড়ে আছে। তোমার সামনে আমার নাক মাটিতে লেগে আছে। হে আল্লাহ্! তোমার সামনে দোয়ারত আমাকে হতভাগ্য কর না। আমার প্রতি করুণা কর, দয়া কর। হে আল্লাহ্ তুমি সে সত্ত্বা, যে সবচেয়ে বেশী দোয়া কবুল কর! সবচেয়ে উত্তম প্রদানকারী। (আমার দোয়া কবুল কর)"। [আল্ জামে আস্‌সাগীর লেসিউতি (রহঃ) ১ম খন্ড; ৫৬ পৃষ্ঠা]

হে আল্লাহ্‌তাআলা! আমাদেরকে এ পবিত্র রমযানে তোমার প্রিয়জনদের মত করে দোয়া করার শক্তি দাও। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর উম্মতের জন্য, তাঁর প্রিয় মাহ্‌দী (আঃ)-এর অনুসারীদের জন্য যে সমস্ত দোয়া করে গেছেন আমাদেরকে তাঁর ওয়ারীশ (উত্তরাধিকারী) বানাও। আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে তোমার প্রকৃত বান্দা (ইবাদতগুযার) বানাও। আমরা তোমার সামনে যেন ঝুঁকে থাকি। তোমার সাহায্য চাইতে থাকি, তোমার নির্দেশাবলীকে মেনে চলতে পারি। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি দয়া কর। ফযল কর, আমাদের জীবনে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বিজয় করে দেখাও। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এ রমযানের সীমাহীন কল্যাণ প্রদান কর। প্রত্যেক অনিষ্ট, মন্দ থেকে বাঁচাও। তোমার রহমতের ও ফযলের আবরণের মধ্যে চিরদিন আবৃত করে রাখ।" (আমীন) [আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৩ইং]

অনুবাদ–মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

পোপ উপস্থাপিত বক্তব্য ও আহমদীয়া খলীফার প্রতিক্রিয়া

তৃতীয় পক্ষের বরাতে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করে ইসলামের খাঁটি শিক্ষা উপস্থাপন

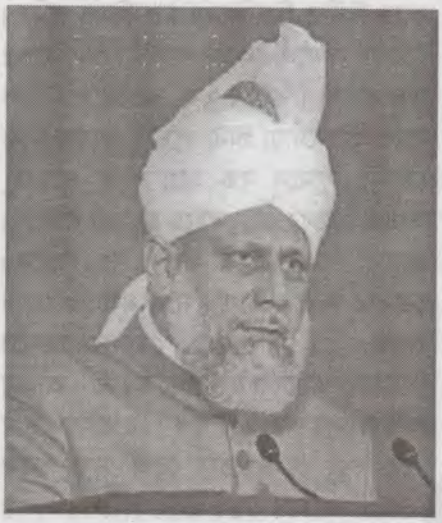

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখ মসজিদ বায়তুল ফুতূহ, (মরডেন) লন্ডনে প্রদত্ত]

হুযূর (আইঃ) তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন,

গতকাল একটি খবর পেলাম, পোপ বেনেডিক্ট পঞ্চদশ (Pope Benedict XVI) বেভেরিয়ার একটি ইউনিভর্সিটিতে তাঁর বক্তৃতায় ইসলামী শিক্ষার কিছু সমালোচনা করেছেন। কুরআন ও রসূলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধে অপর এক লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে এমন সব কথা বলেছেন যার সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্ক নেই। তাদের চাতুরতাপূর্ণ পন্থা হলো, তারা খুব সাবধানতার সাথে অন্য কারো উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত রেখে এসব কথা বলে দেয়। পোপ সাহেব ইসলাম ও রসূলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধে কিছু কথা বলেছেন যাতে একটি খারাপ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে। এতে মুসলমানদের মাঝে এক অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে তারা অন্তরে কি লালন করছেন-তা তাঁর এ বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে। পোপ এমন এক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যে কোন ক্রমেই এ ধরনের কথা বলা তাঁর জন্য সমীচীন ছিল না। বিশেষত এই যুগে, যখন পশ্চিমা বিশ্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে, ঠিক তখন পোপের এ ধরনের কথা বলা জ্বলন্ত আগুনে তেল ঢালারই নামান্তর। বরং তার এ কথা বলা উচিত ছিল, কিছু কিছু মুসলিম সংগঠন আজ যে হিংসাত্মক পথ নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছে তা ইসলামের খাঁটি শিক্ষার পরিপন্থী বলে মনে হয়। দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করা উচিত যাতে নিরীহ লোকদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করা যায়। উল্টো তিনি নিজ অনুসারীদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন, ইসলামের শিক্ষা এমনই বিকৃত। আমি পোপ সাহেবকে একজন বিচক্ষণ ও জ্ঞানী মানুষ মনে করতাম আর ভাবতাম তিনি ইসলাম সম্বন্ধে কিছু না কিছু জ্ঞান রাখেন। কিন্তু এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে তিনি নিজের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যে মসীহ্‌র প্রতিনিধিত্ব করার দাবী করেন কমপক্ষে তাঁর (আঃ) শিক্ষা অনুযায়ী বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা পোপের উচিত ছিল। তিনি অর্থাৎ ঈসা (আঃ) নিজ শত্রুর প্রতিও উত্তম আচরণের শিক্ষা দিয়েছেন। মহানবী (সাঃ) ও কুরআন সম্বন্ধে ভুল মন্তব্য করে একদিকে তিনি মুসলমানদের আবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন আর এর পরিনতিতে যে প্রতিক্রিয়া হবার হবে। যে মুসলমান নিজের আবেগ সংবরণ করতে পারে না সে এমন অপরাধ করতেই থাকবে। এতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের একটি সুযোগ এরা লাভ করবে। দ্বিতীয়ত, পোপের এই মন্তব্যে তার অনুসারী এবং পশ্চিমারা যারা ইসলামকে বলপ্রয়োগের ধর্ম

মনে করে তাদের হৃদয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্ তা'লা রহম করুন এবং দুনিয়াকে সব ধরনের অশান্তি ও বিশৃংঙ্খলা থেকে রক্ষা করুন (আমীন)। আহমদীদের সর্বদা দোয়ায় রত থাকা উচিত। আর দোয়ার পাশাপাশি পোপ সাহেব যে প্রশ্নের অবতারণা করেছেন আর যে বক্তব্য রেখেছেন, প্রত্যেক দেশ থেকে এর সমুচিত উত্তর দেয়া উচিত। আমদের হাতে কেবল এ দুটি অস্ত্রই আছে, যার দ্বারা আমাদের কর্মোদ্ধার করতে হবে। অন্য কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া কখনো আহমদীদের দ্বারা প্রকাশিত হয়ও নি আর ইনশাল্লাহ্ হবেও না।

এ পর্যায়ে পোপ প্রদত্ত বক্তব্যের সংশ্লিষ্ট অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে আমি পড়ছি যেখানে তিনি কুরআন ও মহানবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি একটি কথোপকথন পড়েছিলাম যা জার্মানির এক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর প্রকাশ করেছিলেন আর এই পুরনো কথোপকথন এক জ্ঞান পিপাসু সিজার ম্যানুয়েল ও এক পারস্যবাসী আলেমের মাঝে সম্ভবত ১৩৯১ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর

লেখাটি এক খৃষ্টান পন্ডিত সংগ্রহ করেছে। (হুযূর (আইঃ) বলেন,) কিন্তু তিনি এ কথাও স্বীকার করেন, যেহেতু এই কথোপকথন এক খৃষ্টান পন্ডিতের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে এ কারণে সে-ই বেশীর ভাগ কথা বলেছে। তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা কতটুকু তা এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে। মুসলমান আলেমের বক্তব্য কাটছাঁট করেছে আর নিজের বক্তব্য বিস্তারিত লিখেছে। যাই হোক, পোপ প্রশ্ন তুলে বলেছেন, আমি ঐ বক্তব্যের একটি বিষয়ে কথা বলতে চাই, সিজার নিশ্চিত জানতো ধর্মের ব্যাপারে কোন বলপ্রয়োগ নাই কেননা সে সূরা বাকারার ২৫৬ আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছে। তিনি বলেছেন, সিজার নিশ্চিতভাবে কুরআনের জেহাদ সম্পর্কিত আয়াতের বিষয়ে জ্ঞাত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, আহলে কিতাব ও কাফেরদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করার শিক্ষা রয়েছে। এবং সিজার আশ্চর্যজনক আবেগে তার সঙ্গীকে মৌলিক প্রশ্ন করে, ধর্ম এবং বল প্রয়োগ এদের পারস্পরিক সম্পর্ক কী হতে পারে? এরপর সে প্রশ্ন করে, আমাকে বলুন মুহাম্মদ (সাঃ) নতুন কি নিয়ে এসেছেন? তার শিক্ষায় কেবল মন্দ ও অমানবিক বিষয়ই দেখতে পাওয়া যায়। যেমন তার প্রচারিত বিশ্বাসকে তিনি তরবারির জোরে প্রসারের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এরপরে সিজার বলেন, ধর্মে বল প্রয়োগের বিষয়টি খোদার শিক্ষা এবং ঐশ্বরিক গুণাবলীর বিপক্ষে। এবং তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'লা রক্তপাত পছন্দ করেন না। বিবেক বিবর্জিত কাজ আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর পরিপন্থী। আত্মার এক প্রকার ফসলের নাম ঈমান, এটা দেহের ফসল নয়। সিজার গ্রীক দর্শনের আলোকে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেছিল। তার জন্য উপরে উল্লেখিত বাক্যটি যুক্তিযুক্ত ছিল। ইসলামী শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গীতে খোদার সত্তা সম্পূর্ণভাবে একটি গোপন অস্তিত্ব এবং তিনি জ্ঞানের কোন শাখার অধিনস্থ নন এমন কি যুক্তি-প্রমাণেরও তিনি অধিনস্থ নন। আল্লাহ্ যে বিবেক বুদ্ধি বিবর্জিত কাজ করতে পারেন না এটি একটি গ্রীক দর্শন নাকি নিজ সত্তায় এটি একটি স্থায়ী সত্য? আমার দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে গ্রীক দর্শন ও বাইবেল পরিবেশিত খোদার অস্তিত্বের মাঝে এক গভীর সাদৃশ্য রয়েছে।

আমি আগেই বলেছি, তিনি স্বীকার করেছেন, সিজারের নিজের কথা পারস্য আলেমের তুলনায় অনেক বেশী বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। আর যে খৃষ্টান পন্ডিত নিজের এই উপাখ্যান লিখেছে সে যে নিজের গরিমা প্রকাশের জন্য একাজ করেছে–এ কথা স্পষ্ট। তার নিজের যুক্তি সাব্যস্ত করাই তার লক্ষ্য ছিল। প্রতিপক্ষের কোন যুক্তিই উপস্থাপিত হয়নি। যাই হোক, আমি এখন আমাদের অর্থাৎ আহমদী মুসলমানদের বিশ্বাসগুলো পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সাঃ)-এর জীবনীর আলোকে বর্ণনা করছি। দীর্ঘ আলোচনা করা এখানে সম্ভব না। কিন্তু পোপের জন্য ইনশাল্লাহ্ এ সকল প্রশ্নের উত্তর তৈরী করে দেয়া হবে এবং তাকে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হবে। যাতে ইসলামের সঠিক শিক্ষার বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের ঘাটতি থাকলে তিনি যেন তা পুষিয়ে নেন। শর্ত হলো, নিজের অবস্থান উপলব্ধি করে নিরপেক্ষভাবে তিনি তা পড়বেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন। আমরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে অনেক সম্মান করি। আমরা তাঁকে আল্লাহ্ তা'লার নবী বলে মানি। বরং সকল ধর্মের যত নবী এসেছেন তাঁদের সকলকে আমরা মান্য করি। খৃষ্টানদের উচিত মুসলমানদের অনুভূতির দিকে লক্ষ্য রেখে মুহাম্মদ (সাঃ)-কেও সমীহ ও সম্মান করা। আমি আগেও বলেছি, সিজারের উদ্ধৃতি দিয়ে পোপ সাহেব এ কথা বলেছেন, সূরা বাকারার ২৫৬ নম্বর আয়াতের ব্যাপারে সিজারের নিশ্চিত জ্ঞান ছিল। আর তা হলো 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ নেই। তিনি বলেছেন এ সূরাটি মহানবী(সাঃ)-এর প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ কিন্তু সিজার পরবর্তী সুরাগুলোর বিষয়েও জানতেন। আর জেহাদ সংক্রান্ত সূরাগুলোর শিক্ষার ব্যাপারেও তার জ্ঞান ছিলো। (হুযূর বলেন,) সে জানতো কিনা তা বলতে পারবো না তবে বিদ্বেষের দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই তার ছিল। সে বলেছে, ধর্মে বল প্রয়োগ না থাকা সত্ত্বেও কুরআন অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করার শিক্ষা দেয় (নাউযুবিল্লাহ্)। মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষায় কখনও মন্দ ও অমানবিক আচরণের শিক্ষা দেখা যায় না। এ ব্যক্তির কথা অনুযায়ী ইসলামকে তরবারীর জোরে প্রসার করা হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ্)। সে অন্যায় ভাবে এমন দোষারোপ করেছে যার সাথে ইসলামী শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। এ বিষয়ে সে নিজেই সিদ্ধান্ত প্রদান করে বলছে, এটা বিবেক বিবর্জিত বিষয়, এবং আল্লাহ্ তা'লার ন্যায় আচরণের পরিপন্থী। সে বলেছে, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পেশী-শক্তি, বলপ্রয়োগ বা অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না।

(হুযূর বলেন,) সে ঠিকই বলেছে। এক বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য সত্যিই এর প্রয়োজন নেই। তাহলে আজকাল তারা তাদের পরাশক্তির জোরে হাজার মাইল দূরে বসে অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়ে শক্তির অপব্যবহার কেন করছে? এর জবাব তিনি দেন নাই। তার উচিত, কোন্‌টি ঠিক কোন্‌টি বেঠিক প্রথমে নিজের লোকদেরকে তা বোঝানো। আর খৃষ্টানদের নিজেদের মাঝে যে সকল যুদ্ধের ইতিহাস রয়েছে সেদিকেও তিনি দৃষ্টি দেন নি। এগুলোর হিসেব কে দিবে? স্পেনে যে মুসলিম বিতাড়ন ও নিধন সংঘটিত হয়েছিল সে বিষয়ে তার বক্তব্য কী? আর স্পেনের মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষাপটও তিনি বর্ণনা করেননি। ইনকুজিশন (Inquisition) এর বৃত্তান্ত আমিও এ পর্যায়ে বর্ণনা করতে পারছি না। পোপ সাহেব বলেছেন, ধর্ম বিস্তারের

ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা কী তা সিজার জানতো। মহানবী (সাঃ)-এর কর্মপন্থা কি ছিল আসলে সে ব্যক্তি তা অবহিত ছিল না। এক্ষেত্রে তাঁর (সাঃ)-এর বাস্তব আচরণ কি ছিল আমি তা তুলে ধরছি ঃ

ইসলাম স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম। যিশু খৃষ্টের মত মহানবী (সাঃ) এক গালে চড় খেয়ে আরেক গাল পেতে দেয়ার শিক্ষা দেন নি। কিন্তু যাদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তারা এ শিক্ষার ওপর কতটুকু আমল করেছে তা তারাই ভাল বলতে পারবে। তাদের শিক্ষার মাঝে এ দূর্বলতা থাকার কারণে খৃষ্টানরা খৃষ্টধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সপ্তাহে রোববার গীর্জায় যাওয়া খৃষ্টানদের রীতি। কিন্তু বর্তমানে বৃদ্ধ-প্রবীনরা ছাড়া আর কাউকে গীর্জায় বড় একটা দেখা যায় না। তারা গীর্জাকে অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেয়া শুরু করেছে। পশ্চিমা বিশ্বে অগণিত স্থানে গীর্জার গায়ে **"For Sale"** লেখা সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা যায়।

আমেরিকার এক প্রফেসর এডভেন ডুইস লিখেছেন, বিংশ শতাব্দীর মানুষ ঈসা (আঃ)-কে খোদা মানতে রাজী নয়। অক্সফোর্ডের সেন্ট জোন্স (ST. JONES) কলেজের প্রেসিডেন্ট স্যার সাইরেল লিখেছেন, 'এ কথা মনে রাখতে হবে, ইউরোপ ও আমেরিকার নর-নারীর উল্লেখযোগ্য অংশ আজ আর খৃষ্টান নেই। আর যদি বলা হয় বেশীর ভাগ লোকের দশা এমনই তবে এটা বেঠিক হবে না।' এ কথা তারা নিজেরাই অকপটে স্বীকার করে, খৃষ্টধর্মের শিক্ষা এখন নিশ্বেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত।

ইসলামে বলপ্রয়োগের ব্যাপারে যে অভিযোগ তারা দিয়ে থাকে এর প্রকৃত স্বরূপ কী? পোপ সাহেব বলেছেন, কুরআনের আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে সেই সিজার অবগত ছিল। চলুন দেখি এ বিষয়ে কুরআন কী বলেঃ

"আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "কুলিল হাক্কু মিররাব্বিকুম, ফামান শাআ ফাল্ইউমিন ওয়া মান শাআ ফাল্ইয়াক্ফুর" (সূরা কাহাফ ঃ ৩০)। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে দিয়ে ঘোষণা করাচ্ছেন, 'তুমি জগদ্বাসীকে বলে দাও, ইসলাম তোমার খোদার পক্ষ্য থেকে সত্য ধর্ম। সুতরাং যার ইচ্ছা এর প্রতি ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা একে অস্বীকার করুক। কেননা, 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন'-এর শিক্ষা রয়েছে।

এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে আরও বলেছেন ঃ

"কুল ইয়া আইয়ূহান্নাসু কাদ জাআকুমুল হাককু মিররাব্বিকুম, ফামানিহ্তাদা ফাইন্নামা ইয়াহ্তাদি লিনাফসিহি, ওয়া মান যাল্লা ফাইন্নামা ইয়াযিলু আলাইহা ওয়া মা আনা আলাইকুম বিওয়াকিল" (সূরা ইউনুস ১০৯)।

অর্থাৎ হে রসূল (সাঃ)! তুমি লোকদেরকে বলে দাও, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য এসেছে। যে এ পথনির্দেশ গ্রহণ করবে সে এর কল্যাণ নিজেই ভোগ করবে আর যে পথভ্রষ্ট হবে এর শাস্তি তারই ওপর বর্তাবে। আমি তোমাদের হেদায়াতপ্রাপ্তির বিষয়ে দায়িত্ব নিয়ে আসিনি।

মহানবী (সাঃ)-এর জীবনে এর বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই। ইহুদী গোত্র বনু নাযিরের কাছে আনসারদের মানত করা কিছু পুত্র সন্তান লালিত হচ্ছিল। এক যুদ্ধে বনু নাযিরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মহানবী (সাঃ) তাদেরকে দেশান্তরের শাস্তি দেন। সে সময় আনসাররা তাদের নিজ সন্তানদেরকে ফেরত পেতে চাইলে তিনি (সাঃ) নিষেধ করে বল্লেন, তোমরা যখন এদেরকে একবার দিয়েই দিয়েছ তখন এরা তাদের কাছেই থাকবে কেননা ধর্মের ব্যাপারে বল প্রয়োগ নেই।

এই ছিল মহানবী (সাঃ) প্রদত্ত শিক্ষা। যার ফলশ্রুতিতে খলীফাগণ ও সাহাবারা তাঁর (সাঃ)- এ শিক্ষাই বাস্তবায়ন করতেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-র এক অমুসিলিম কৃতদাস ছিল। সে বর্ণনা করে, "হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে বেশ কয়েকবার মুসলমান হতে বলেন। কিন্তু প্রতিবার আমার অস্বীকার করাতে তিনি বলতেন, 'ঠিক আছে, তোমার অস্বীকার করার অধিকার আছে কেননা ইসলামে বল প্রয়োগ নেই।' আর যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো, তিনি আমাকে বল্লেন, আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম, তোমার যেখানে খুশি যেতে পার।"–এই হলো ইসলামের শিক্ষা ও তার বাস্তবায়ন। যে ক্ষেত্রে একটি কৃতদাসের প্রতিও বলপ্রয়োগ হয়নি সেক্ষেত্রে পোপ সাহেব কীভাবে বলেন, ইসলামে বল প্রয়োগের শিক্ষা আছে! পুনরায় পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

"কুললিল্লাযীনা উতুল কিতাবা ওয়াল উম্মীয়ানা আআসলামতুম। ফাইন আসলামু ফাকাদিহাতাদাও, ওয়া ইন তাওয়াল্লাও ফাইন্নামা আলাইকাল বালাগ ওয়াল্লাহু বাসিরুম বিল ঈবাদ" (সূরা আলে ইমরান, ঃ ২১)।

অর্থ ঃ 'হে রসূল (সাঃ) তুমি কিতাবপ্রাপ্ত ও নিরক্ষরদের বলে দাও, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করবে? অতএব তারা আনুগত্য করে ইসলাম গ্রহণ করলে নিশ্চয়ই তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হলো। আর তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে তোমার দায়িত্ব কেবল সত্য পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদেরকে দেখছেন।' বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার আওতাধীন। তিনি কাকে ধরবেন, কাকে শাস্তি দিবেন, কার সাথে কি ব্যবহার করবেন তা তিনিই সিদ্ধান্ত নিবেন। এই হলো আল্লাহ্র নির্দেশ।

শেষোক্ত আয়াতটি এমন এক সময় নাযিলকৃত যখন মুসলমানরা শক্তিধর হয়ে

গিয়েছিল। অতএব মিথ্যা অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন না করে এদের (অর্থাৎ খৃষ্টান নেতাদের) যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলা উচিত। **ইসলাম ধর্মে বল প্রয়োগের একটিও উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না।**

মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করা হয়, তিনি নাকি ধর্মের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করেছেন। বল- প্রয়োগ করা তো দূরের কথা, কেউ কপটতার ছলে মুসলমান হোক এটাও মহানবী (সাঃ) চাইতেন না।

এক বর্ণনানুযায়ী, এক অমুসলিম বন্দী এসে মহানবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, সে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাকে কেন আটক রাখা হয়েছে? তিনি(সাঃ) বল্লেন, **এখন আর এর সুযোগ নেই। (যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির) পূর্বে বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হতো এখন তুমি যুদ্ধ বন্দী হবার ভয়ে মুসলমান হচ্ছো।** অতএব মহানবী (সাঃ) নিঃসন্দেহে বল প্রয়োগ করে মুসলমান বানাতে চান নাই। তাঁর (সাঃ) আকাঙ্খা ছিল, মানবহৃদয় যেন আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হয়। পরবর্তীতে শত্রুপক্ষের শিবিরে বন্দী দুই মুসলমানের মুক্তির বিনিময়ে মহানবী (সাঃ) এ অমুসলিম বন্দীকে মুক্তি দেন।

ইসলাম ধর্ম কেবল তখনই যুদ্ধ করার অনুমতি দেয় যখন শত্রুপক্ষ প্রথমে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করে। যখন অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যায় অথবা নৈরাজ্য দূরীভূত হয়, মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষা অনুযায়ী তখন আর যুদ্ধ পরিচালনার কারণ থাকে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন ঃ

"ওয়া কাতেলুহুম হাত্তা লা তাকুনা ফিতনাতুন ওয়া ইয়াকুনাদ্দিনু লিল্লাহি, ফাইনিনতাহাও ফালা উদওয়ানা ইল্লা আলায্ যালেমীন" (সূরা বাকারা ঃ১৯৪)।

অর্থ ঃ হে মুসলমানগণ! তোমরা দেশ থেকে নৈরাজ্য দূর না হওয়া পর্যন্ত সে সকল কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর **যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।** ধর্ম খোদার খাতিরে হওয়া উচিত। আর কাফেররা যদি বিরত হয়ে যায় তবে তোমরা থেমে যাও। **কেননা যালেম ছাড়া অন্য কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি নেই।** আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলেছেন, "তোমরা সেই সব কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।" এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এই ঐশী নির্দেশ বাস্তবায়নে মহানবী (সাঃ)-এর যুগে যখন মুসলমানেরা সংখ্যায় অল্প ছিল, কেউ মুসলমান হলে ধর্মের কারণে তাকে কষ্ট দেয়া হতো। আর অনেককে হত্যা করা হতো এবং অনেককে বন্দী করে রাখা হতো। তখন আমরা কেবল ততদিন যুদ্ধ করেছি যতদিন মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি না পেয়েছে এবং নৈরাজ্য দূরীভূত না হয়েছে, এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনাচার বন্ধ না হয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ

"ইয়া আইয়ূহাল্লাযীনা আমানু কুনু কাওয়ামিনা লিল্লাহি শুহাদাআ বিলকিসতি ওয়া লা ইয়াজরিমান্নাকুম শানাআনু কাউমিন আলা আল্লা তা'দিলু, ই'দিলু, হুয়া আকরাবু লিতাক্ওয়া ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা খাবিরুম বিমা তা'মালুন" (সূরা আল মায়েদা ঃ ৯ আয়াত)।

'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সজাগ দৃষ্টি নিয়ে ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদেরকে যেন অবিচারে প্ররোচিত না করে। বরং তোমরা ন্যায় বিচার কর। এটা তাক্ওয়ার নিকটতম আচরণ। আর আল্লাহ্কে ভয় কর কেননা তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।'

রসূলে করীম (সাঃ)-এর যুগেও এ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং তাঁর পরবর্তী কালে ও এ ন্যায় বিচার মুসলিম সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। সাহাবাদের জীবনীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাদের (রাঃ) মাঝে যে আমূল পরিবর্তন হয়েছিল তা কখনই বল-প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভবপর ছিল না। একমাত্র হৃদয়ের পরিবর্তনের মাধ্যমেই এ ধরনের বিপ্লব সংঘটিত হয়ে থাকে। আর শত্রুর সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমেই এ বিপ্লব ঘটানো সম্ভব হয়।

মক্কা বিজয়ের সময় ইসলামের ঘোর শত্রু ইকরামা পালিয়ে যায়। তার স্ত্রী তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য মহানবী (সাঃ)-এর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। লক্ষ্য করুন, এর ফলে তার মাঝে কী বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল! অস্ত্র বলে এ পরিবর্তন সাধন কখনই সম্ভব ছিল না। তাঁর (রাঃ) ঈমান এত উৎকর্ষ লাভ করেছিল যা আন্তরিক ভালবাসা ছাড়া সম্ভব ছিল না। তাঁর হৃদয় আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করে তা ভালবাসা ছাড়া সম্ভবপর ছিল না। তাঁর ত্যাগ ও কুরবানীর মান যে এত উন্নত হয়েছিল এর একমাত্র কারণ হলো তাঁর হৃদয়ের অভাবনীয় পরিবর্তন। ইসলামের জন্য তাঁরা এমন অতুলনীয় মর্যাদাবোধ প্রদর্শন করেছেন যা তাদের ইসলামকে আন্তরিকভাবে অনুধাবন করারই পরিচায়ক। ইসলামের ইতিহাস সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ত্যাগ ও ভালবাসার দৃষ্টান্তে ভরপুর। আমি এখন ইকরামার এসব বিষয়ে কিঞ্চিত উল্লেখ করবো ঃ

ইসলামের বিরুদ্ধে প্রত্যেক যুদ্ধে সে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে। আমি আগেই বলেছি মক্কা বিজয়ের সময় সে পালিয়ে যাচ্ছিল। মহানবী (সাঃ)-এর ক্ষমা পেয়ে ফিরে আসলো, আর তাঁর মুসলমান হবার পর তিনি অভূতপূর্ব আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে রাষ্ট্রদ্রোহিদেরকে পরাভূত

করার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত তিনি উপস্থাপন করেছেন। সে সময় এক যুদ্ধে মুসলমানরা ভয়ানক এক অবস্থার সম্মুখীন হয়। শত্রুপক্ষ মুসলমানদেরকে কচুকাটা করছিল। হযরত ইকরামা (রাঃ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে শত্রু বাহিনীর মূল কেন্দ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অনেক সাহাবী তাঁকে নিষেধ করে বলেছেন, ভয়াবহ যুদ্ধ হচ্ছে, এ পর্যায়ে শত্রু সারিতে প্রবেশ করা ঠিক হবে না। হযরত ইকরামা এ কথা মানলেন না। কথিত আছে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন, (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) আমি 'লাত' ও 'উযযার' খাতিরে মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আজ খোদার খাতিরে যুদ্ধ করতে পিছিয়ে থাকবো না। যুদ্ধশেষে দেখা গেল, তাঁর (রাঃ) লাশ বর্ষা ও তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে।

আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ উন্নতি করেন। হুনায়নের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে তাঁর যা আয় হতো, তা তিনি অকাতরে সদকা করে দিতেন। ধর্মসেবায় তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। **এ পরিবর্তন কেবল মানুষের অভ্যন্তরীণ বিপ্লব সাধনের মাধ্যমেই সম্ভব, তরবারি দিয়ে নয়।**

অমুসলিমরা অপবাদ দিয়ে বলে, মহানবী (সাঃ) গায়ের জোরে মুসলমান বানাতেন। ইসলামী ইতিহাসে অজস্র ঘটনা এ অপবাদকে স্পষ্টভাবে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। রসূলে করীম (সাঃ)-এর এ বিষয়ে কি শিক্ষা ছিল? একটি শিক্ষা বর্ণিত আছে ঃ

মহানবী (সাঃ) বলেন, "যে মুসলমান এমন এক অমুসলিমকে হত্যা করে যে মৌখিক বা অন্য কোন চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছে, সে জাগতিক শাস্তি ছাড়াও কেয়ামতের দিন জান্নাতের সুশীতল বাতাস থেকেও বঞ্চিত থাকবে।"

কথিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ) একদিন এমন এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে কিছু অমুসলিমের কাছ থেকে কর-আদায়ে কঠোরতা প্রদর্শন করা হচ্ছিলো। এটা দেখে হযরত ওমর (রাঃ) থেমে গেলেন, এবং রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার! এসব কী হচ্ছে? বলা হলো, এরা কর দেয় না, এদের নাকি সামর্থ নেই। হযরত ওমর (রাঃ) বল্লেন, তাদের ওপর অযথা কঠোরতা আরোপ কেন করছো ? আমি মহানবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি ইহকালে মানুষকে কষ্ট দেয়, সে কেয়ামতকালে আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করবে।" অতএব তাদের কর মওকুফ করে দেয়া হয়।

মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষা অনুযায়ী হযরত ওমর (রাঃ) ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের বিষয়ে খুব বেশী যত্নবান ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বিশেষভাবে এ উপদেশ দিয়ে গেছেন ঃ

"আমি আমার পরের খলীফাকে তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিচ্ছি, তিনি যেন ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের ক্ষেত্রে নম্রতা ও সহানুভূতির আচরণ করেন। তাদের চাহিদা যেন পূর্ণ করেন। তাদের প্রতি যেন এমন বোঝা অর্পন না করেন যা বহন করা তাদের সাধ্যতীত।"

খায়বারে ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত মহানবী (সাঃ)-এর চুক্তিটিও লক্ষ্যণীয়। তাঁর (সাঃ) মদীনা গমনের পরপরই তাদের সাথে একটি চুক্তি হয়েছিল। মহানবী (সাঃ) তাদের কাছ থেকে উৎপাদনের কর আদায়ের জন্য হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহাকে(রাঃ) প্রেরণ করতেন। মহানবী(সাঃ)-এর শিক্ষা অনুযায়ী হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রাঃ) ইহুদীদের সাথে বড়ই নম্র আচরণ করতেন। কর আদায়ের জন্য ফসল বন্টনের পর ইহুদীদেরকে প্রথমে সুযোগ দিয়ে বলতেন, তোমাদের যে অংশ পছন্দ তা নিয়ে নাও। এরপর যেটা অবশিষ্ট থাকতো তা তিনি (রাঃ) নিয়ে আসতেন।

আমি আগেই বলেছি, মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষা অনুযায়ী হযরত ওমর (রাঃ) অমুসলিম নাগরিকদের দিকে সুনজর রাখতেন। তিনি (রাঃ) তাঁর কর্মীদেরকে এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে বলতেন। আর সুযোগ পেলে তিনি (রাঃ) নিজেও সরাসরি খোঁজ-খবর নিতেন। একবার এক অমুসলিম নাগরিক হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট আসলে তিনি (রাঃ) সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোন কষ্ট পাও না তো?' সে বললো, 'আমি এখানকার মুসলমানদের পক্ষ থেকে কেবল বিশ্বস্ততা ও উত্তম ব্যবহারই পেয়েছি।'

সিরিয়া বিজয়ের পর মুসলমানরা শাসক হিসেবে সেখানকার খৃষ্টানদের কাছ থেকে কর আদায় শুরু করলো। কিছু দিন পরই রোমানদের সাথে পুনরায় যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হল। সিরিয়ায় নিযুক্ত মুসলিম শাসক হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) সংগ্রহিত সমস্ত কর খৃষ্টানদের ফেরত দিয়ে বলেন, যুদ্ধাবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা যেহেতু তোমাদের সুরক্ষা করতে পারছি না তাই এ কর গ্রহণের অধিকার আমাদের নেই। খৃষ্টানরা এ ব্যবহারে উচ্ছাসিত হয়ে দোয়া করেছেন, 'আল্লাহ্ আপনাদেরকে আবার বিজয়ী বেশে পুনরায় এ দেশের শাসক হিসেবে ফিরিয়ে আনুন। মুসলমানরা পুনরায় বিজয় লাভ করলে খৃষ্টানরা আবার মুসলমানদেরকে কর দেয়া আরম্ভ করে।" এখন বলুন, এর নামই কি বল প্রয়োগ? মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারীরা যদি নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি যাচাই করে তবে তারা দেখতে পাবে মহানবী (সাঃ) অমুসলিমদের প্রতি কত ভালবাসা রাখতেন। তাদেরকে তিনি (সাঃ) ভালবাসার সাথে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন। মহানবী (সাঃ) নিজে এবং সাহাবীরা বিজয় লাভের পরও অমুসলিমদের প্রতি কত যত্নবান ছিলেন, এ বিষয়ে একটি ঘটনা রয়েছে।

মদীনায় একবার এক ইহুদী বালক অসুস্থ হয়ে পড়লো। সংবাদ পেয়ে নবী করীম (সাঃ) তাকে দেখতে গেলেন। তার শেষ অবস্থা অনুভব করে তিনি (সাঃ) তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। মহানবী (সাঃ)-এর তবলীগে তার মন বিগলিত হলো। কিন্তু তার পাশেই তার বাবা দাঁড়িয়ে থাকায় সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলো। তার বাবা বল্লেন, তোমার মন চাইলে তুমি গ্রহণ করতে পারো। ইহুদী বালকটি কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। এতে রসূলে করীম (সাঃ) খুব খুশী হলেন আর বললেন, "আল্লাহ্‌র শোকর একটি প্রাণ আজ আগুনের আযাব থেকে মুক্তি পেল।"

কুরআন বর্ণিত কিছু শিক্ষা এবং মহানবী (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ যা আমি তুলে ধরলাম, এ থেকে অত্যাচার ও বল প্রয়োগের অপবাদটি মিথ্যা সাব্যস্ত হল। এ-ও সাব্যস্ত হল, **'ইসলাম অস্ত্র বলে প্রসার লাভ করেনি।'**

আমি খুতবার প্রারম্ভেই স্পেনের ইনকুজিশন (Inquisition)-এর বিষয়টি উল্লেখ করেছিলাম। এর মাধ্যমেও এদের ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যায়।

ন্যায়পরায়ণ খৃষ্টান এবং তাদের ধর্মযাজকরা মহানবী (সাঃ) সম্বন্ধে কী বলেছেন আমি এখন তা উল্লেখ করছি।

* স্যার থমাস কারলেয়ল সাহেব (Sir Thomas Carlyle) তার বইয়ে লিখেছেন, "আমাদের অর্থাৎ খৃষ্টানদের মাঝে যে কথা প্রচলিত আছে তা হলো, মুহাম্মদ (সাঃ) এক ষড়যন্ত্রকারী, কামপূজারী, ধর্মীয় উন্মাদনা ও খাময়েলীর একটা স্তুপ-এ সমস্ত কথা এখন ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। যে সমস্ত মিথ্যা অপবাদ বিদ্বেষী খৃষ্টানেরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর আরোপ করেছিল ঐ সমস্ত অপবাদ এখন আমাদের লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণী যা তিনি ১২০০ বছর পূর্বে ব্যক্ত করেছিলেন তা এখন ১৮ কোটি মানুষের জন্য হেদায়াতের কারণ হচ্ছে (যে যুগে কারলায়েল সাহেব তার এ বক্তব্য রেখেছিলেন সে যুগের গণনা)। বর্তমানে যত মানুষ মুহাম্মদ(সাঃ)-এর কথায় ঈমান রাখে তাঁর তুলনায় অন্য কারো কথায় মানুষ এত বেশী ঈমান রাখে না। আমার মতে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্ম এক মিথ্যাচারীর ধর্ম–এর চেয়ে বড় কোন মিথ্যা নেই।

* স্যার ইউলিয়াম মিউর (Sir William Muir) যিনি একজন ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদ, তিনি তার লেখায় অনেক অবান্তর কথাও লিখেছেন। তবে তিনি এ কথাও স্বীকার করেছেন, "দীর্ঘকাল যাবত যে সমস্ত সামাজিক কুসংস্কার ও কদাচার আরব উপদ্বীপকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রেখেছিল, মুহাম্মদ (সাঃ) তার অধিকাংশই দূরীভূত করেছেন। সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে ইসলাম নানা গুণের সমাহার। নিঃসন্দেহে মুসলমানদের জন্য এটি গর্বের বিষয়, এ ধর্মে খোদা ভীতি ও পবিত্রতার যে মূল্যায়ণ রয়েছে তা অন্য কোন ধর্মে নেই।"

* এডওয়ার্ড গিবেন সাহেব (Edward Gibbon) লিখেছেন, 'মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তাঁর নবুয়্যত সকলের জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছে। যারা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ঘোর শত্রু এবং খৃষ্টান ও ইহুদীরাও তাঁকে নবী না মানা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করবে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়তের দাবী নিশ্চিত এক কল্যাণকর উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। আর তারা একথাও স্বীকার করবে, জগতের সকল ধর্মের চেয়ে তাদের নিজস্ব ধর্মের পর ইসলাম ধর্মই সবচেয়ে ভাল। মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষের জীবন বিসর্জন প্রথার স্থলে রোযা ও সদকা-খয়রাতের প্রচলন করেছেন যা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় কাজ। দেব-দেবীর সমীপে প্রচলিত বলিদান প্রথা তিনি বিনাশ করেছেন। মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষের মাঝে পুণ্য ও ভালবাসার প্রাণ সঞ্চার করেছেন। পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর আদেশ নসিহতের মাধ্যমে তিনি মানুষের মাঝে পারস্পরিক প্রতিশোধ প্রবনতা, বিধবা ও এতিম নির্যাতন রোধ করেছেন। যে সমস্ত জাতি পরস্পর প্রাণের শত্রু ছিল তারা তাঁর (সাঃ) মাধ্যমে আনুগত্যে একত্র হয়েছে। মিথ্যা অহমিকায় লিপ্ত শত্রুদেরকে তিনি (সাঃ) ঐক্যবদ্ধ এক জাতিতে পরিণত করেছেন।'

* জন ডেভেন পোল লেখেন, 'কুরআনের শিক্ষা তরবারির মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে এটা মনে করা অন্যায়। যাদের প্রকৃতি বিদ্বেষ মুক্ত তারা এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করবে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মের মাধ্যমে মানুষ-বলিদানের স্থলে নামায ও খয়রাত জারি হয়েছে। শত্রুতা ও স্থায়ী যুদ্ধের জায়গায় তিনি উদারতা ও সৌহার্দের শিক্ষা দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তা প্রাচ্যের জন্য এক খাঁটি বরকত প্রতীয়মান হয়েছিল। বিশেষ করে এ কারণেই মুহাম্মদ(সাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি যা হযরত মূসা (আঃ) বিনা ব্যতিক্রমে ও নির্বিচারে প্রতিমা পূজা নিধনকল্পে প্রয়োগ করেছিলেন। অতএব এমন মহান ব্যক্তিত্ব যাকে প্রকৃতি মানবীয় চিন্তা ও সমস্যাদীর ক্ষেত্রে এক সুদীর্ঘ প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে সৃষ্টি করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে অসম্মানসূচক ও অজ্ঞতা প্রসুত আচরণ করা কত বড় মূর্খতার পরিচায়ক!'

* এডওয়ার্ড গিবেন সাহেব (Edward Gibbon) আরও লিখেন, 'যদিও ইসলামী নবী তাঁর সময়ে পরিচালিত ধর্মযুদ্ধগুলোকে পবিত্র আখ্যা দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যে সব উপদেশ প্রদান এবং উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করেন এর কারণে তাঁর সময়ে খলীফাগণ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। আরব দেশ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর খোদার ঈবাদতের স্থান ছিল এবং তাদের

জন্য বিজিত দেশ ছিল। তারা চাইলে বহু দেব-দেবীর পূজারী ও মূর্তি উপাসকদেরকে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মূল করতে পারতেন। কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ) পূর্ণ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন।'

* কাউন্ট টলস্টয় সাহেব (Count Tolstoy) বলেন, 'মুহাম্মদ (সাঃ) যে এক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সমাজ সংস্কারক ছিলেন এবং তিনি যে মানুষের সেবা করেছেন-এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি তাঁর জাতিকে সত্যের দিকে নিয়ে গেছেন। তাঁরা খোদাভীতির জীবনকে প্রধান্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর জাতির জন্য অন্যায় রক্তপাত নিষিদ্ধ করেছেন। তাদের সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতার পথ খুলে দিয়েছেন। এমন কাজ কেবল ঐ ব্যক্তিই করতে পারে যার সাথে অদৃশ্য কোন শক্তি থাকে। আর এমন ব্যক্তি সকলের সম্মান ও ভক্তির পাত্র।'

* বার্ণড 'শ (George Barnard Shaw) লেখেন, 'মধ্য যুগীয় খৃষ্টান ধর্মযাজকরা অজ্ঞতা ও বিদ্বেষের কারণে ইসলাম ধর্মের এক ভয়ংকর চিত্র অংকন করেছে। শুধু তাই নয় তারা মুহাম্মদ(সাঃ)-কে ভাল নামে উল্লেখও করতে চায় নি। আমি গভীরভাবে এই বিষয়টি অধ্যায়ন ও প্রত্যক্ষ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, মুহাম্মদ (সাঃ) এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং প্রকৃত অর্থে তিনি মানব মুক্তির দূত ছিলেন।'

* বসওয়েল স্মিথ (Rev. Boswell Smith) যিনি একজন খৃষ্টান বিশেষজ্ঞ তিনি লেখেন, 'মুহাম্মদ (সাঃ) একক সত্তায় পোপ ও সিজার উভয়ের চরিত্র ও দায়দায়িত্ব সন্নিবেশিত ছিল। তিনি একদিক থেকে পোপ হওয়া সত্ত্বেও পোপের বাহ্যিকতামুক্ত ছিলেন। অপরাঙ্গিকে তিনি সিজারের প্রাপ্য বাহ্যিক আড়ম্বরতা ও ঐশ্বর্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। জগতে সেনা-বাহিনী ছাড়া, রাজ-প্রাসাদ ও অট্টালিকা ব্যতিত এবং বাধ্যতামূলক কর আদায় ছাড়া কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নামে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব যদি কোন একক ব্যক্তির থেকে থাকে তবে সে ব্যক্তি হলেন হযরত মুহাম্মদ(সাঃ)। বাহ্যিক অস্ত্র ও উপকরণ ছাড়াই তিনি এ সমস্ত শক্তির অধিকারী ছিলেন।'

* প্রিঙ্গেল কেনেডি সাহেব (Pringle Kennedy) লেখেন, 'পরিষ্কার ভাষায় যদি বলতে হয় তবে আমি বলব মুহাম্মদ (সাঃ) যুগের এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর অসাধারণ সফলতাকে বুঝতে হলে আমদেরকে তাঁর সমসাময়িক যুগের অবস্থা অবশ্যই পর্যালোচনা করতে হবে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের সাড়ে পাঁচ'শ বছর পর তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন। সে যুগে গ্রীক রোমীয় এবং আরব উপদ্বীপের একশএক-টি রাজ্যের সকল পুরোনো ধর্ম তাদের আধ্যাত্মিক প্রভাব হারিয়ে ফেলেছিল। এর স্থলে রোমীয় রাজত্বের প্রতিপত্তি সে যুগের বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোমীয় সম্রাটের বিধান মতে ক্ষমতাসীন রাজত্বের পূর্ণ আনুগত্য ও উপাসনা যেন সে যুগে রোমীয় সম্রাজ্যের রাজধর্মে পরিণত হয়েছিল। অন্যান্য ধর্ম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেগুলো এই নতুন গণপ্রবণতার অধীনস্থ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্য জগতকে স্বস্তি প্রদান করতে পারেনি। ফলে প্রাচ্যের বিভিন্ন মতবাদ মিশরীয়, সিরিয় এবং পারস্য জাতীয়াতাবাদ রোমীয় সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে বেশীর ভাগ ধার্মিক লোকদেরকে প্রভাবিত করেছিল। এসব ধর্মীয় মতবাদের লজ্জাকর দিক হলো, এরা নৈতিকতার দিক থেকে চরম অধঃপতিত অবস্থায় ছিল। যে খৃষ্ট ধর্মমত চতুর্থ শতাব্দীতে রোমীয় সাম্রাজ্য জয় করেছিল সেটা নিজেই তখন রোমীয় মূল্যাবোধ অবলম্বন করে ফেলেছিল। খৃষ্ট ধর্মমত তখন আর খাঁটি একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল না যার শিক্ষা মাত্র তিন শতাব্দী পূর্বে দেয়া হয়েছিল। তখন এটি সম্পূর্ণভাবে বস্তুবাদী, জাগতিক ও পার্থিবতার পুজারী হয়ে গিয়েছিল। এসব সত্ত্বেও মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এত বিরাট এক বিপ্লব সাধিত হয় কীভাবে? ৬৫০ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের পর বিশ্বের বিরাট অংশে পূর্বের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে এক ভিন্নরূপ ধারণ করে। নিঃসন্দেহে এটি মানব ইতিহাসের এক মহান অধ্যায়। এ বিপ্লব আরও সম্প্রসারিত হয়। মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র জীবন বিশ্বের ইতিহাসে যে প্রভাব বিস্তার করেছে এতে স্বীকার করতেই হবে, মানুষের মাধ্যমে জগতে সংঘটিত বিপ্লবসমূহের মধ্যে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাধিত বিপ্লবই সর্বশ্রেষ্ঠ। উগ্রপন্থী খৃষ্টান ও প্রাচ্যবিদদের বিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও এর সুগভীর প্রভাব বিস্তার অব্যাহত থাকে।'

* এসপি স্কট সাহেব (S.P. Scott) লেখেন, 'ধর্মের উদ্দেশ্য যদি হয় নৈতিকতার সৃষ্টি এবং পাপকে দূর করা এবং উত্তম চারিত্রিক সংশোধন আর মানুষের মানবীয় গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন আর যদি নেক আমলের প্রতিদান সে দিনই পাওয়ার থাকে যেদিন সমস্ত মানুষের কৃতকর্ম আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থিত করা হবে তবে স্বীকার করতেই হবে মুহাম্মদ (সাঃ) নিঃসন্দেহে খোদা তা'লার রসুল ছিলেন। আর এই দাবী কোনভাবেই ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক নয়।'

* ক্র্যানষ্টেন সাহেব লেখেন, মুহাম্মদ (সাঃ) কখনো যুদ্ধ বা রক্তপাতের সূচনা করেননি। তাঁর প্রতিটি যুদ্ধ ছিল আত্মরক্ষামূলক। তিনি যে যুদ্ধই করেছেন নিজ অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে করেছেন। আর এমন অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এবং এমন পদ্ধতিতে যুদ্ধ করেছেন যা সে যুগের প্রচলিত রীতি ছিল। ১৪ কোটি খৃষ্টানদের মাঝে (১৯৫০ সালের লেখা) যারা অতি সম্প্রতি একটি বোমা নিক্ষেপ করে ১ লাখ ২০ হাজার লোক হত্যা

করেছে কেউই সে মহান ব্যক্তিত্বের চরিত্রের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যিনি তাঁর সমগ্র জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর মূহূর্তে সংঘটিত যুদ্ধে সর্ব সাকূল্যে ৫০০/৬০০ মানুষকে যুদ্ধাবস্থায় হত্যা করেছেন। এই আরবীয় নবীর হাতে সংঘটিত সপ্তম শতাব্দীর ক্ষয়ক্ষতিকে (যখন মানুষ একে অপরের রক্তের পিপাসু ছিল) এ যুগের মানদন্ডে যাচাই করা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই না। স্পেনের ইনকুজিশন এবং মধ্যযুগীয় ক্রুসেডস-এর সময় খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা রক্তপাতের রেকর্ড গড়েছে যখন খৃষ্টান যোদ্ধারা বেদুঈনদের লাশের মাঝে গোড়ালি সমান রক্তে বিচরণ করেছিল।

* ডেভেন পোর্ট লেখেন, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, পাশ্চাত্যের যুবরাজরা যদি মুসলমান মুজাহিদ আর তুর্কি শাসকদের স্থলে এশিয়ার শাসক হতো তবে এরা মুসলমানদের সাথে এরূপ ব্যবহার করতো না যেরূপ ব্যবহার মুসলমানরা খৃষ্টানদের সাথে করেছে। কেননা খৃষ্টানরা ভিন্নমত পোষণকারী স্বগোত্রীয়দের সাথে বিভৎস আচরণ করেছে যাদের সাথে তাদের ধর্মীয় বিষয়ে মতপার্থক্য ছিল।

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর যুগে এক অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠকারী এক ব্যক্তি অভিযোগ করেন, কুরআন শরীফে বল প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে মুসলমান বানানোর নির্দেশ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "এই ব্যক্তি নিজস্ব কোন বুদ্ধি বিবেচনাও রাখে না, জ্ঞানও রাখে না। পাদ্রীদের অভ্যাস হলো, তারা হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে নিজেদের বই পত্রে 'ইসলাম ধর্মে বল প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমান বানানোর আদেশ রয়েছে' এই বলে অপবাদ দিয়ে থাকে। তাই কোন ধরনের যাচাই বাছাই ছাড়া সে এবং তার ভাইয়েরা পাদ্রীদের মিথ্যা অভিযোগগুলোর পুনরাবৃত্তি করেছে। অথচ কুরআন শরীফে স্পষ্ট ভাষায় এ আয়াতটি বিদ্যমান ঃ লা ইকরাহা ফিদ্দীন ক্বাদ তাবায়্যানার রুশদু মিনাল গাইয়ে।

অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ে কোনরূপ বল প্রয়োগ নেই। নিশ্চয়ই পথ নির্দেশনা ও পথ ভ্রষ্টতার মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের প্রয়োজনটা কিসের? অবাক লাগে, পবিত্র কুরআন বার বার স্পষ্ট আকারে বিস্তারিত ভাবে ধর্মে কোন প্রকার বল প্রয়োগ নেই ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও যারা শত্রুতায় সীমালঙ্ঘন করেছে, তারা খোদার বাণীতে বল প্রয়োগের শিক্ষা রয়েছে বলে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে!

এখন আমি আরেকটি আয়াত উল্লেখ করে ন্যায় পরায়ণদের কাছে সুবিচার দাবী করছি। তারা যেন আল্লাহ্কে ভয় করে আমাকে বলেন, উল্লেখিত আয়াতে ধর্ম বিষয়ে বল প্রয়োগ সিদ্ধ না নিষিদ্ধ কোন্ শিক্ষাটি স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়।

"ওয়া ইন আহাদুম মিনাল মুশরিকিনাসতাজারাকা ফা আজিরহু হাত্তা ইয়াসমাআ কালামাল্লাহি সুম্মা আবলিগহু মা'মানাহু। যালিকা বিআন্নাহুম ক্বাউমুন লা ইয়া'লামূন" (সূরা তওবা ঃ ৬)।

অর্থাৎ হে রসূল (সাঃ), মুশরেকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে তুমি তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আশ্রয় প্রদান কর যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ ও অনুধাবন না করে। এরপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। এ সুযোগ তাদেরকে কেবল এ কারণে দেয়া প্রয়োজন, যেন তারা ইসলামের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে অবহিত হয়। বলা বাহুল্য, পবিত্র কুরআন বল প্রয়োগের শিক্ষা দিলে কখনই এ কথা ঘোষণা করতো না "কাফের আল্লাহ্র বাণী শুনতে চাইলে তাকে তা শুনতে দাও এবং পরে তাকে অমুসলমান অবস্থায় তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।" বরং এমন কাফেরকে বাগে পাওয়ার সাথে সাথে মুসলমান বনিয়ে নেয়ার শিক্ষা দেয়া হতো।

পোপ সাহেবের পক্ষ থেকে উত্থাপিত দ্বিতীয় অভিযোগটি হলো, ইসলামের খোদা এমন খোদা যাকে মানুষের বুদ্ধি বিবেক স্বীকার করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্ম যে খোদা জগতের সামনে উপস্থাপন করেছে, তিনি এমন এক খোদা যিনি নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ যাচাই করার জন্য মানুষকে তার বুদ্ধি-বিবেক খাটানোর আহ্বান জানাচ্ছেন। কেউ যদি বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং এর একচ্ছত্র অধিপতি তাহলে একথাও স্বীকার করতে হয়, তিনি সর্বময় শক্তির অধিকারী। খোদার বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করার জন্য হাসি ঠাট্টা-বিদ্রুপের পরিবর্তে বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ ও গভীর মনোনিবেশের প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন, "ইসলাম ধর্মের খোদা হলেন সেই সত্য খোদা যাকে প্রাকৃতিক নিয়মের দর্পনে আর মানুষের বিবেকের আয়নায় দেখা যায়। ইসলাম ধর্ম কোন নতুন খোদা উপস্থাপন করে না বরং সেই খোদাকে উপস্থাপন করে যাকে মানুষের অন্তরের জ্যোতি মানুষের বিবেক আর এ বিশ্ব জগত উপস্থাপন করেছে" (তবলীগে রেসালাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ১৫)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইসলাম ধর্ম পরিবেশিত যৌক্তিক খোদা সম্বন্ধে আরও বলেনঃ

জানা উচিত, যে খোদার দিকে কুরআন আমাদেরকে আহ্বান করছে, সে খোদার গুণাবলী নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে–

"হয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আলিমুল গাইবে ওয়াশাহাদাতি, হুয়ার রহমানুর রাহীম, মলিকিয়াওমিদ্দীন আলমালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির, হুয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুসাব্বিরু লাহুল আসমাউল হুসনা, ইউসাব্বিহু লাহু মা ফিসসামাওয়াতি ওয়াল আরদ, ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম, আলা কুল্লি শাইঈন

ক্বাদির, রাব্বিল আলামীন, আর রহমানির রাহীম, মালিকিইয়াওমিদ্দীন উজিবু দা'ওয়াতাদ্দায়ি ইযা দাআন, আল হাইয়ূল কাইয়ূম, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহু সামাদ, লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালামইয়া কুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ।"

অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় খোদা হলেন তিনি যিনি ব্যাতিত অন্য কেউ উপাসনা ও (পূর্ণ) আনুগত্যের যোগ্য নয়। তাঁর এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, তিনি যদি অদ্বিতীয়-অতুলনীয় না হন সেক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতাকে কোন শত্রু পরাভূত করতে পারে। এ পর্যায়ে তাঁর ঈশ্বরত্ব বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়বে। আর তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাঁর এই বক্তব্যের অর্থ হলো, তিনি এমন এক পূর্ণাঙ্গীন খোদা যার যাবতীয় গুণ, বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ এত উৎকৃষ্ট ও উচ্চ মার্গের, সমস্ত বিদ্যমান সত্তার মাঝ থেকে যদি পূর্ণাঙ্গীন গুণাবলীর আলোকে একজন খোদা মনোনীত করতে হয়, অথবা নিজ অন্তরে উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর ঐশ্বরীক গুণাবলীর কথা উকে কল্পনা করে সেক্ষেত্রে তাঁর (অর্থাৎ খোদার নিজস্ব গুণবালীর) চেয়ে অন্য কারো গুণাবলী উন্নত ও উচ্চতর হতে পারে না। তিনি সেই খোদা যার উপাসনায় কোন তুচ্ছ সত্তাকে অংশিদার করাও এক বড় অনাচার। তিনি আরও বলেছেন, তিনি আলেমুল গায়েব অর্থাৎ নিজ সত্তাকে একমাত্র তিনিই জানেন। তাঁর সত্তাকে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। আমরা চন্দ্র-সূর্য ও প্রত্যেক সৃষ্টিকে আপাদমস্তক দেখতে পাই কিন্তু খোদা তা'লার সত্তাকে আমরা আপাদমস্তক দেখতে অক্ষম। এরপর তিনি বলেছেন, তিনি 'আলিমুশ শাহাদাত' কোন কিছুই তার দৃষ্টির আড়ালে নয়। খোদা আখ্যায়িত হওয়া সত্ত্বেও যাবতীয় বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান থেকে অনবহিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তিনি এ জগতের প্রতিটি অণু পরমাণুর প্রতি দৃষ্টি রেখে থাকেন কিন্তু মানুষ তা রাখতে পারে না। একমাত্র তিনিই জানেন এ জগত-বিধানকে তিনি কবে ভঙ্গ করবেন এবং মহাপ্রলয় সংঘটিত করবেন। তিনি ছাড়া কেউ জানে না এ ঘটনা কখন হবে। অতএব একমাত্র তিনিই হলেন খোদা যিনি এ সমস্ত নির্ধারিত ক্ষণ ও মূহূর্ত সম্বন্ধে অবগত। তিনি আবার বলেছেন, হুয়ার রহমান অর্থাৎ তিনি সমস্ত জীবের অস্তিত্ব লাভ ও তাদের কর্মসম্পাদনেরও পূর্বে নিছক নিজ দয়ার কারণে তাদের জন্য স্বাচ্ছন্দের উপরকরণ সরবরাহ করেন অন্য কোন কারণে বা কারো কর্মের ফলশ্রুতিতে নয়। উদাহরণস্বরূপ আমাদের অস্তিত্ব লাভ ও আমাদের কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই তিনি আমাদের জন্য সূর্য, পৃথিবী ও সমস্ত উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কিতাবে এই দানের নাম.হল রাহমানিয়্যাত এবং এ কর্মের প্রেক্ষিতে খোদা তা'লাকে 'রহমান' বলা হয়। এরপর তিনি বলেছেন, তিনি 'রাহীম' অর্থাৎ তিনি সেই খোদা যিনি পুণ্য কর্মের উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন এবং কারো পরিশ্রম বিনষ্ট হতে দেন না। এ কর্মের প্রেক্ষিতে তাঁকে 'রহিম' বলা হয়। এবং এই গুণটি 'রাহিমিয়্যাত' নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। এরপর তিনি বলেছেন, তিনি 'মলিকিইয়াওমিদ্দীন' অর্থাৎ সেই খোদা প্রত্যেকের কর্মফল তাঁর নিজ আয়ত্বে রাখেন। তাঁর পক্ষ থেকে এমন কোন কার্য-নির্বাহক নিযুক্ত নাই যার হাতে তিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব অর্পন করে দিয়ে নিজে সরে গেছেন। আর তিনি নিজে কিছুই করেন না বরং সেই কার্য-নির্বাহকই সবাইকে প্রতিদান কিংবা শাস্তি প্রদান করে থাকেন বা আগামীতে করবেন।

আবার তিনি বলেছেন, তিনি 'আল মালিকুল কুদ্দুস' অর্থাৎ সেই খোদা সর্বাধিপতি, সব ধরনের ত্রুটি মুক্ত। বলাবাহুল্য, মানুষের রাজত্ব ত্রুটিমুক্ত নয়। উদাহরস্বরূপ, সমস্ত প্রজা যদি দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে পালিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে মানবীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না কিংবা সমস্ত প্রজা যদি দুর্ভিক্ষগ্রস্থ হয়ে পড়ে তবে রাজস্ব বা খাজনা আসবে কোথা থেকে? আর প্রজারা যদি রাজা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে, আমাদের তুলনায় তোমার মাঝে বাড়তি কি গুণ আছে? তখন সে (রাজা) নিজের কোন্ যোগ্যতা সাব্যস্ত করবে? অতএব খোদা তা'লার রাজত্ব এমন নয়। এক নিমিষে তিনি সমস্ত রাজ্য ধ্বংস করে নতুন সব জীব সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি এমন স্রষ্টা ও শক্তিধর না হলে অত্যাচার অনাচার ছাড়া তাঁর রাজত্ব চলতে পারতো না কেননা তিনি জগতকে একবার ক্ষমা ও মুক্তি দান করে আর একটি জগত কোথা থেকে আনতেন? তবে কি তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদেরকে জগতে আনার জন্য আরেকবার ধরে নিয়ে আসতেন আর অন্যায়ভাবে তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ক্ষমা ও মুক্তি ফেরত নিয়ে নিতেন? সেক্ষেত্রে তাঁর ঈশ্বরত্বের মাঝে ত্রুটি ধরা পড়তো। আর তিনি সেই জাগতিক রাজা-বাদশাহ্‌র মত ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত হতেন যারা জগদ্বাসীর জন্য আইন তৈরী করে কথায় কথায় ভোল পাল্টান। আর নিজ স্বার্থ রক্ষার সময় যখন তারা অত্যাচার-অনাচার ছাড়া গত্যন্তর দেখতে পান না তখন অত্যাচার-অনাচারের পথটিকেই মাতৃদুগ্ধের মত সানন্দে বেছে নেন। যেমন ঃ রাজকীয় আইনে একটি জাহাজকে রক্ষা করার জন্য একটি নৌকার আরোহীদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া বা তাদেরকে মরতে দেয়া আইন-সিদ্ধ কিন্তু খোদার পক্ষে এ ধরনের অপারগ অবস্থা সৃষ্টি হওয়া সমীচীন নয়। অতএব খোদা তা'লা যদি পূর্ণাঙ্গীন শক্তিধর না হতেন আর অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বদানের ক্ষমতা না রাখতেন তবে তিনি হয় দুর্বল রাজাদের মত অসীম শক্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে অত্যাচার-অনাচারের পথ বেছে নিতেন অথবা ন্যায় পরায়ণ সেজে নিজের ঈশ্বরত্বকেই জলাঞ্জলী দিয়ে দিতেন। প্রকৃতপক্ষে, খোদা তা'লার জাহাজ তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে সত্যিকার ন্যায়-নীতির পথে চলমান। আবার তিনি

বলেছেন 'আস সালাম' অর্থাৎ তিনি সেই খোদা যিনি সমস্ত দোষ, বিপদ ও কষ্ট থেকে নিরাপদ বরং তিনি অন্যদেরকে নিরাপত্তা দানকারী। এর অর্থও অতি স্পষ্ট। কেননা তিনি যদি নিজেই বিপদগ্রস্থ হতেন, মানুষের হাতে মারা পড়তেন এবং নিজ ইচ্ছা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হতেন, তাহলে এই দুর্দশা অবলোকন করে মানবাত্মা কীভাবে একথা ভেবে আশ্বস্ত হতো, এমন খোদা আমাদেরকেও বিপদমুক্ত করতে সক্ষম?

অতএব আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যা উপাস্যদের বিষয়ে বলেছেন ঃ

"ইন্নাল্লাযীনা তাদউনা মিনদুনিল্লাহি লাইয়াখলুকু যুবাবান ওয়ালাও ইজতামাআ লাহু। ওয়া ইন ইয়াসলুবহুমুয যুবাবু শাইআন লা ইয়াসতানকিযুহু। যাউফাততালিবু ওয়াল মাতলুব, মা ক্বাদারুল্লাহা হাক্কা ক্বাদরিহি, ইন্নাল্লাহা লাক্বিউন আযীয" (সূরা হাজ্জ আয়াত ঃ ৭৪)।

যাদেরকে তোমারা খোদা বানিয়ে ফেলেছো তারা সবাই মিলে একটি মাছি সৃষ্টি করতে চাইলেও তা তারা কখনই করতে পারবে না। একে অপরকে সাহায্য করলেও না! উল্টো মাছি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেলে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করার ক্ষমতা রাখে না। এদের উপাস্য বিবেক-বুদ্ধির ক্ষেত্রেও দূর্বল এবং ক্ষমতার দিক থেকেও দুর্বল॥ **সত্য খোদা কি এমন হতে পারে?**

প্রকৃত খোদা তিনিই যিনি সব শক্তিধরের চেয়ে বেশী শক্তিশালী আর সবার তুলনায় পরাক্রমশালী। তাঁকে কেউ ধরতেও পারে না মারতেও পারে না। যারা এসব বিষয়ে ভ্রষ্টতার স্বীকার হয়েছে তারা আল্লাহ্ তা'লার যথাযথ মূল্যায়ণ করেনি। আল্লাহ্ কেমন হওয়া উচিত তা-ও তারা জানে না। এরপর তিনি বলেছেন, খোদা নিরাপত্তা বিধায়ক এবং নিজ গুণাবলী ও একত্ববাদের বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপনকারী। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সত্য খোদার অনুসারী কোন অনুষ্ঠানে লজ্জিত ও অপদস্থ হয় না। আর খোদার সম্মুখেও সে লজ্জিত হবে না কেননা তার কাছে শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। কিন্তু কৃত্রিম খোদাকে মান্যকারী সর্বদা বিপদগ্রস্থ থাকে। সে কোন ধরনের যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন না করে যত সব অনর্থক কথাকে রহস্য বলে ব্যক্ত করে। আর স্বীকৃত ভুল-ভ্রান্তিকে সে গোপন করার চেষ্টা করে যেন কেউ বিদ্রুপ করতে না পারে। এরপর তিনি বলেছেন,

'আল মুহাইমিনুল আযিযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির' অর্থাৎ তিনি সবার সুরক্ষাকারী, মহাপরাক্রমশালী, দূরাবস্থার সংশোধনকারী, সব ধরনের মুখাপেক্ষীতার উর্ধ্বে। তিনি আরও বলেন,

'হুয়াল্লাহুল খালিকুল বারিউল মুসাব্বিরুলাহুল আসমাউল হুসনা' অর্থাৎ তিনি এমন খোদা যিনি সমস্ত দেহ অবয়বের স্রষ্টা এবং সমস্ত আত্মারও স্রষ্টা, মাতৃগর্ভে আকৃতি দাতা। মানুষের চিন্তায় যত ধরনের ভাল নাম কল্পনা করা সম্ভব সব তাঁরই।

এররপর তিনি বলেছেন,

'ইউসাব্বিহু লাহু মা ফিসসামাওয়াতি ওয়াল আরদ, ওয়া হুয়াল আজিজুল হাকীম' অর্থাৎ আকাশে বসবাসকারীরা এবং পৃথিবীর অধিবাসীগণ উভয়ে-ই যথাযথ পবিত্রতা ও প্রশংসা সহ তাঁর নাম উচ্চারণ করে। এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, **মহাশূন্যের বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রে জীব ও জনপদ বিদ্যমান।** আর তারাও আল্লাহ্ তা'লার পথ-নির্দেশনার অধীনস্থ। এরপর তিনি বলেন, **'আলা কুল্লি শাইঈন কাদির' অর্থাৎ খোদা বড়ই শক্তিধর। এই ঘোষণা এক খোদার ঈবাদতকারীদের জন্য প্রশান্তির কারণ। কেননা খোদা যদি সর্বশক্তিমান না হয়ে দূর্বল বা অসহায় হন তাহলে এমন খোদার কাছে কী আশা করা যেতে পারে?** এরপর বলেছেন,

'রাব্বুল আলামিন আর রাহমানির রাহিম মালিকিইয়াও মিদ্দিন' 'উজিবু দা'ওয়াতাদ্দায়ে ইযা দাআন' অর্থাৎ তিনি খোদা যিনি সমস্ত বিশ্ব জগতের লালন কর্তা। তিনি রহমান, রহিম এবং প্রতিদান প্রতিফল দিবসের তিনিই একচ্ছত্র মালিক। তিনি তাঁর এই ক্ষমতা অন্য কাউকে অর্পন করেন নি। প্রত্যেক প্রার্থনাকারীর ডাক তিনি শ্রবণ করেন এবং সাড়া দেন। অর্থাৎ তিনি দোয়া কবুলকারী।

এরপর আবার বলেছেন, তিনি 'আল হাইউল কাইউম' অর্থাৎ চিরস্থায়ী এবং সমস্ত প্রাণীর নির্ভরস্থল আর সকল সত্তার আশ্রয়স্থল। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, তিনি যদি আদি ও চিরস্থায়ী না হন তাহলে তাঁর জীবন নিয়ে মানুষের মনে সংশয় থাকতো, আমাদের আগেই আবার না তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আর এর পরে তিনি বলেছেন, খোদা এক-অদ্বিতীয়, তিনি কারো পুত্র নন এবং কেউ তাঁর পুত্রও নয়। আর কেউ তাঁর সমকক্ষ নয় এবং তাঁর সমপ্রজাতিরও কেউ নেই।" (ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তক দ্রষ্টব্য।)

খৃষ্ট ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ

হযরত আকদাস ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন, "স্মরণ রাখতে হবে, বর্তমানে যে মতবাদকে খৃষ্টধর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয় সেটা প্রকৃতপক্ষে মসীহ্ (আঃ) প্রচারিত ধর্ম নয় বরং সাধু পৌল (St. Paul) উদ্ভাবিত মতবাদ। হযরত মসীহ্ (আঃ) কখনো কোথাও ত্রিত্ববাদের শিক্ষা প্রদান করেন নি। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এক অদ্বিতীয় খোদার ঈবাদতের শিক্ষা প্রচার করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত ভাই 'যেকব' তিনিও তৌহিদ বা এক খোদার ঈবাদতের শিক্ষা দিয়েছেন। পৌল বিনা কারণে এই বুযুর্গ ব্যক্তির বিরোধিতা আরম্ভ করে এবং তাঁর স্পষ্ট নির্দেশনার বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রচার আরম্ভ করে। আর শেষ পর্যন্ত পৌল নিজস্ব চিন্তা ধারায় অগ্রসর হয়ে পরিণামে সে এক নতুন

ধর্ম প্রবর্তন করে। এবং তওরাতের অনুসরণ থেকে তাঁর জামাতকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করে দেয়। এবং সে এ কথা ছড়িয়ে দেয়, মসীহ্‌র ধর্মে মসীহ (আঃ)-এর প্রায়শ্চিত্তের পর আর কোন ধরনের শরিয়তের প্রয়োজন নেই কেননা যিশুর রক্তই আমাদের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যথেষ্ট। তাই তওরাতের অনুসরণ করারও প্রয়োজন নেই। এর পাশাপাশি আর একটা নোংরা প্রথা মসীহী মতবাদে সে প্রচলন করে। অর্থাৎ, শুকর ভক্ষণকে সে বৈধ বলে ঘোষণা দেয় অথচ হযরত মসীহ্ (আঃ) ইঞ্জিলে শুকরকে অপবিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। মসীহ্ (আঃ) ইঞ্জিলে বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের মণি-মাণিক্য শুকরদের সম্মুখে নিক্ষেপ করো না'। অতএব পবিত্র শিক্ষার নাম যেহেতু তিনি মণি-মাণিক্য রেখেছেন তাই এই উপমা দ্বারা স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হলো, নোংরা ও অপবিত্রকে তিনি শুকর বলে আখ্যয়িত করেছেন। প্রকৃত সত্য হল, গ্রীকরা শুকর ভক্ষণ করতো যেভাবে বর্তমানে সমস্ত ইউরোপ শুকর খেতে অভ্যস্ত। তাই পৌল গ্রীকদের মনজয় করার লক্ষ্যে শুকরকে নিজ জামাতের জন্য বৈধ ঘোষণা করেছে অথচ তওরাতে লেখা আছে শুকর স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ এমনকি তা স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। মোটকথা, এই ধর্মমতের সমস্ত অনিষ্টের গোড়া হলো সেন্ট পৌল (St. Paul)।"

পোপ সাহেব তার বক্তব্যে গ্রীকদর্শন ও বাইবেল ভিত্তিক ইশ্বরত্বের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এই সাদৃশ্যের কারণ হলো, বর্তমান খৃষ্টধর্ম আদৌ ঈসা (আঃ) প্রচারিত ধর্ম নয়। বরং এটা গ্রীকদেরকে আকর্ষণ করার জন্য পৌলের একটি অপচেষ্টার ফসল। যারা ন্যায়পরায়ণ খৃষ্টান, তারা জানেন ইসলাম পরিবেশিত খোদার দর্শন কী।

এডবার্ড গিভেন সাহেব (Edward Gibbon) লেখেন, "মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রচারিত ধর্ম সকল প্রকার সন্দেহ ও অস্বচ্ছতা মুক্ত। পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের এক উত্তম স্বাক্ষী। মক্কা নিবাসী নবী [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ)] প্রতিমা, মানুষ এবং গ্রহ নক্ষত্রের পূজাকে হৃদয়গ্রাহী যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার সত্তার বিষয়ে যুক্তি ও ওহী নির্ভর শিক্ষা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে সমাজে দৃঢ়তা লাভ করেছে। এই মতবাদে বিশ্বাসী মানুষ হিন্দুস্থান থেকে আরম্ভ করে মরক্কো পর্যন্ত 'মুয়াহ্‌হেদ' বা একেশ্বরবাদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।"

এই হলেন ইসলামের খোদা। বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন চিন্তশীল ব্যক্তি এ কথা বলতে বাধ্য হয়, ইসলামের খোদা যৌক্তিক এবং এ দর্শন গ্রহণযোগ্য।

পরিশেষে আমি প্রত্যেক আহমদীকে সম্বোধন করে বলতে চাই, ইসলামের বিরুদ্ধে যে আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি চলছে, এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ আল্লাহ্‌র কাছে বিনত হওয়া এবং তাঁর সাহায্য কামনা করা। তাই আল্লাহ্‌কে আগের চেয়ে বেশী বেশী করে ডাকুন যেন তিনি তাঁর অসীম কুদরতের বিকাশ ঘটান। মিথ্যা খোদার কবল থেকে জগত যেন মুক্তি পায়। আজ এরা নিজেদের ঐশ্বর্য ও জাগতিক শক্তির অহংকারে লিপ্ত হয়ে ইসলাম এবং মহানবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ রচনা করছে। এক্ষেত্রে আমাদের বিনীত দোয়ার ফলশ্রুতিতে এদের অহংকার দূরীভূত হবে (ইনশাল্লাহ্)। অতএব এ বিশ্ব জগতের একচ্ছত্র মালিক খোদাকে ডাকুন যিনি রাব্বুল আলামীন। যিনি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর খোদা। যেন সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার রাজত্ব এ জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলমানদেরকেও এ বিষয়ে ভাবতে হবে। তারা যেন নিজেদের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ দূর করে। পাস্পরিক যুদ্ধ ও শত্রুতা বন্ধ করে। এক ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে এরা যেন মহানবী (সাঃ) এর সম্মান জগতে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে। এমন সব অপকর্ম থেকে তারা যেন বিরত হয় যার ফলশ্রুতিতে অন্যরা দ্বীন ইসলামকে দোষারোপ করার সুযোগ পায়। আল্লাহ্ তা'লা (সকলের প্রতি তাঁর) বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

{খোতবার এ পর্যায়ে এসে হুযূর (আইঃ) বলেন,} আজও কয়েকটি গায়েবী জানাযা পড়াবো। একটি হলো, মুকাররম পীর মঈনদ্দীন সাহেব এর জানাযা, যিনি খলীফাতুল মসীহ্ সানীর জামাতা ছিলেন। এই দিক থেকে তিনি আমার খালু হন। তিনি জামেয়াতে শিক্ষকতা করেছেন, ফজলে ওমর ফাউন্ডেশনে গাবেষণার দায়িত্বে ছিলেন এবং জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিত্ব ছিলেন, সেই সাথে ওয়াকেফে জিন্দেগীও ছিলেন। দ্বিতীয় জানাযা মোহতারমা আমেনা খাতুন যিনি হযরত মাওলানা নাযির আহমদ মুবাশ্বের সাহেবের স্ত্রী ছিলেন, ইনিও তাঁর স্বামীর সাথে ঘানায় বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তৃতীয় জানাযা মোকাররম মেজর সাঈদ আনোয়ার সাহেবের। এই বুযুর্গ হযরত মীর ইসহাক সাহেবের জামাতা ছিলেন। এর পরের জানাযা মোহতারমা সরদার বেগম সাহেবা তিনি ডাঃ রিয়াজ আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। এ ছাড়া মরিশাসের মুরব্বী মুজাফ্‌ফর সুধান সাহেবের মা এবং আব্দুন নাসের মনসুর সাহেবের মা তাদের জানাযাও পড়া হবে। সবার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা সকল মরহুমকে মাগফেরাত দান করুন। (আমীন)

(হুযূর (আইঃ)-এর খুতবা অডিও ক্যাসেট থেকে শ্রুত। অনুবাদক নিজ দায়িত্বে প্রকাশ করেছেন।)

(খৃষ্টান মনিষী ও ধর্ম যাজকদের যেসব উদ্ধৃতি অনুবাদ করা হয়েছে, সেগুলো মূল ভাষা থেকে অনুবাদ না করায় শব্দ চয়নে কিছুটা তারতম্য হতে পারে। তাই উদ্ধৃতিগুলোর অনুবাদ প্রকৃতপক্ষে ভাবানুবাদ হিসেবেই গণ্য করা সমীচীন। –অনুবাদক)।

অনুবাদক ঃ মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান (পলাশ)
মুবাশ্বের মুরব্বী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

যুক্তরাজ্যের ৪০তম সালানা জলসার দ্বিতীয় দিন ২৯.০৭.২০০৬ তারিখে আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্যে হুযূর (আইঃ)-এর বক্তৃতা

আদর্শ আহমদী নারীর মর্যাদা ও তাঁর দায়-দায়িত্ব

তাশাহ্হুদ, তা'উয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহার পর হুযূর (আইঃ) নিম্নলিখিত আয়াতদ্বয় তেলাওয়াত করে বলেন:

"মা ইন্দাকুম ইয়ানফাদু ওয়া মা ইন্দাল্লাহে বা'ক ওয়া লানাজযিয়ান্নাল্লাযিনা সাবারু আজরাহুম বিআহসানি মা কানু ইয়া'মালুন। মান আমিলা সালেহাম্মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মু'মিনুন ফালানুহ-ইয়ান্নাহু হায়াতান তৈয়্যেবা, ওয়ালা নাজযিয়ান্নাহুম আজরাহুম বিআহসানি মা কানু ইয়া'মালুন "(সূরা নাহলঃ ৯৭ ও ৯৮)।

একজন আহমদী মুসলিম মহিলা আল্লাহ্‌র কাছে চিরকৃতজ্ঞ কেননা তিনি তাকে হয় আহমদী পরিবারে জন্ম দিয়েছেন অথবা সত্যগ্রহণ করে তাকে আহমদী হবার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এ ঐশী অনুগ্রহের জন্য সে যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক তা কম হবে। এই জামাতে এসে এ যুগের ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত ও খাঁটি শিক্ষা সে লাভ করেছে। কেবল প্রকৃত শিক্ষাই সে লাভ করেনি বরং এ জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা কুরআনের খাঁটি শিক্ষা বাস্তবায়নে এই জামাতের প্রতিটি সদস্যের প্রতি নিজ স্ত্রীকে তার যথাযথ অধিকার প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি স্ত্রীকে সম্মান করতে ও তার সাথে নম্রতা ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

একবার স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ইলহাম করে তাঁর এক বিশিষ্ট সাহাবীকে (যিনি নেকী ও তাকওয়ার উচ্চ স্তরে উন্নীত ছিলেন) নিজ স্ত্রীর সাথে কঠোর আচরণের প্রেক্ষিতে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। লক্ষ্য করুন, যাঁর সম্বন্ধে এই

ইলহাম হয়েছে তিনি কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিশিষ্ট সহযোগী এবং এক বড় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের কারণে আল্লাহ্ তা'লা সতর্ক করেছেন। যে মানুষটির ওপর ভবিষ্যত প্রজন্মেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষন প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে মানুষটির সাথে বিনা কারণে অন্যায় আচরণ আল্লাহ্ তা'লা সহ্য করেন না। সেই স্ত্রীকে তুচ্ছ জ্ঞান করাও আল্লাহ্ সহ্য করেন না। বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল স্ত্রীর প্রতি বিনা কারণে অন্যায় আচরণ আল্লাহ্ সহ্য করেন না। তাই এ কাজ থেকে তাকে নিষেধ করে বলেছেন, তাকে বুঝাও এ ধরনের পবিত্র স্ত্রীর সাথে সম্মান ও মর্যাদার আচরণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহাম হয়েছিল–"এই আচরণ সঠিক নয়। এ কাজ থেকে তাকে বিরত করা হোক, মুসলমানদের নেতা আব্দুল করিমকে।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এই ইলহামের মাঝে গোটা জামাতের জন্য শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে, তারা যেন নিজ স্ত্রীদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ ও বিনম্র আচরণ করে, এরা তাদের দাসী নয়' (তোহফায়ে গোলড়াবীয়া, পৃঃ ৩৭, পরিশিষ্ট)।

আরেক স্থলে এক ধরণের অত্যাচারী স্বামীদের উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'তারা (স্ত্রীদের প্রতি) এমন কঠোরতা ও কড়াকড়ি আরোপ করে যেন এদের সাথে জীবজন্তুর কোন তফাতই নেই। এদের প্রতি দাসী ও জীবজন্তুর চেয়েও খারাপ আচরণ করা হয়ে থাকে। তারা এদের এমনভাবে প্রহার করে, বুঝাই যায় না তাদের সম্মুখে কোন জীবিত প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে, নাকি অন্য কিছু!! মোট কথা, তারা এদের সাথে বড় নিকৃষ্ট আচরণ করে থাকে.....এটা গুরুতর একটা বিষয় এবং ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী' (মলফূযাত ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৪৪)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পুরুষদেরকে উপদেশ দিয়ে আরো বলেছেন, 'এ কথা ভেবো না, স্ত্রী এমন জিনিষ যাকে নিতান্তই তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত গণ্য করা যায়। কক্ষনো না! আমাদের পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন– "খায়রুকুম খায়রুকুম লি আহলেহি" তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সে-ই যে নিজ স্ত্রীর সাথে উৎকৃষ্ট আচরণ করে। স্ত্রীর সাথে যার আচরণ ও ব্যবহার ভাল নয় সে পূণ্যবান হয় কীভাবে ! অন্যদের সাথে মানুষ কেবল তখনই নেকী ও ভাল আচরণ করতে পারে যখন সে নিজ স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করবে আর উৎকৃষ্টভাবে বসবাস করবে' (মলফূযাত ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪৭)।

এই হলো ইসলাম প্রদত্ত স্বর্ণ শিক্ষার একটি ঝলক যা এ যুগে হযরত ইমাম

মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদের কাছে পুনরায় তুলে ধরেছেন। এই সুন্দর ইসলামী শিক্ষার বাস্তব রূপায়ণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে ঘটেছিল আজ থেকে চৌদ্দ শ' বছর আগে। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করে মহানবী (সাঃ) ঘোষণা দিয়েছিলেন "আমি তোমাদের মাঝে স্ত্রীদের প্রতি সর্বোৎকৃষ্ট আচরণকারী।" কিন্তু যুগের বিবর্তনে অন্যান্য ইসলামী শিক্ষা মানুষ যেমন ভুলে গেছে, এই শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিথিলতা দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রীদের অধিকার প্রদান, তাদের সাথে নম্র, সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের শিক্ষা মানুষ ভুলে যেতে বসেছে। একজন পূণ্যবতী ও সৎকর্মশীল স্ত্রী এক মহা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আর তা হলো, তাঁর পায়ের তলে সন্তানদের বেহেশ্‌ত। যেহেতু যুগের বিবর্তনের সাথে মহিলাদের মর্যাদা সংরক্ষণের বিষয়ে শিথিলতা দেখা দিয়েছিল, তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রকৃত প্রেমিক যুগ ইমাম হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) এদিকে পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছেন– স্ত্রীদের অধিকার যেন নিশ্চিত করা হয়। মহানবী (সাঃ) মহিলাদেরকে কাঁচের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ তার সাথে কঠোরতামূলক আচরণ তার মন ভেঙ্গে চৌচির করে দিতে পারে। তার দৈহিক গঠন বলুন আর তার সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতিই বলুন, তাকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যার দরুন তার প্রতি নম্রতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ আবশ্যক। স্ত্রীরা পাঁজরের হাড় সদৃশ্য। তার প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বভাবকে কাজে লাগিয়েই তোমরা উপকৃত হতে পারো। অতএব, হে মহিলাগণ, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এমন এক নেতার জামাতভুক্ত হবার সৌভাগ্য প্রদান করেছেন–যাকে তিনি সরাসরি আপনাদের অধিকার স্মরণ করিয়েছেন। এখন চিন্তা করে দেখুন, আপনাদের কতটুকু তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত! তাঁর শিক্ষা ও বিধি-নিষেধ কত বেশী মেনে চলা উচিত! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে যে শিক্ষার ওপর আমল করে আমাদের মাঝে পরিবর্তন আনতে বলেছেন সে শিক্ষাগুলোকে জীবনে বাস্তবায়ন করতে কত বেশী চেষ্টা করা উচিত!

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে আপনাদের জন্য অনেক বিধি-নিষেধ প্রদান করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বাসীদের সম্বোধন করে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গকে সম্বোধন করেছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাকে পৃথক পৃথক ভাবে সম্বোধন করেছেন। বিশ্বাসীদের সম্বোধন করে তিনি যখন কোন আদেশ দেন তখন নারী ও পুরুষ উভয়ই সম্বোধিত হয়। এভাবে তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বুঝিয়েছেন–যে সমস্ত নীতিগত শিক্ষা বিশ্বাসীদেরকে সম্বোধন করে দেয়া হয়েছে তা বিশ্বাসী নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আর আপনারা এসব সৎকর্ম সম্পদন করলে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে চিরস্থায়ী প্রতিদানে ভূষিত করবেন যা আপনাদের ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতকে ঐশী পুরস্কারে পরিপূর্ণ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **"নাহনু আউলিয়াকুম ও ফিল হায়াতিদ্দুনিয়া ওয়াফিল আখেরা ওয়ালা কুম ফিহা মা তাশতাহি আনফুসুকুম ওয়ালাকুম ফিহা মা তাদ্দাউন"** অর্থাৎ আমরা ইহকালে এবং পরকালেও তোমাদের সঙ্গী থাকবো আর সেখানে তোমাদের মন যা চাইবে সব পাবে আর তোমরা যা-ই চাইবে তা সেখানে বরাদ্দ করা হবে। কিন্তু এই মহা প্রতিদানের পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান আনা আর দৃঢ়তা প্রদর্শন করা। এক্ষেত্রে অনড় দৃঢ়তা প্রদর্শনের অর্থ হলো, আপনারা যাঁর কাছে বয়াত করেছেন, যে জীবন্ত খোদার প্রতি ঈমান আনার বিষয়ে আপনারা দাবী করছেন তাঁর যাবতীয় আদেশ পালন করতে হবে। আর এসব আদেশাবলীকে এমনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে যেমনটি একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর কাছে আশা করা হয়।

'আমালে সালেহা' বা যুগোপযোগী সৎকর্ম প্রকৃতপক্ষে তাকেই বলে যা পূণ্য বয়ে আনে, পুণ্যের পথে পরিচালিত করে, যা সবদিক থেকে সঠিক প্রতীয়মান হয়, যা পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও পারস্পরিক অধিকার সংরক্ষণকারী, যা করার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন, যা স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে সম্পাদন করা হয়। এসব হলো **আমালে সালেহা** বা নেক কর্মের অর্থ। এককক্ষেত্রে একটি কাজ বৈধ হতে পারে, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় তা যদি সমীচীন না হয় তাহলে সেটা আমালে সালেহা বলে গণ্য হবে না। প্রকৃত সৎকর্ম সেটাই যার মাঝে একদিকে আল্লাহ্‌র আদেশ বাস্তবায়ন করা হয় সেই সাথে অন্যদের অধিকারও নিশ্চিত করা হয়। যে সব পবিত্র আমলে এসব শর্ত পূর্ণ হবে কেবল সেটাকেই এক মোমেনের আমলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ হিসেবে গণ্য করা যাবে। আর এ ধরণের কর্ম সম্পাদনকারীকে আল্লাহ্ তা'লা সুসংবাদ দান করেছেন– **"ফালানুহইয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যেবা"** অর্থাৎ আমরা অবশ্যই তাকে এক পবিত্র জীবন দান করে পূনঃর্জীবিত করে দেব। সে এমন এক জীবন লাভ করবে যা হবে অতি পবিত্র, যা একাধারে আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কারসমূহ লাভ করতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা সে সব নেক কাজের প্রতিদান দিবেন যা মানুষ ইহকালে সম্পাদন করে। আমি একটু আগেই বলেছি. আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়ে বলেছেন, তিনি এমন দৃঢ়বিশ্বাসীদের আর সৎকর্মশীলদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী প্রতিদান দিয়ে থাকেন। অতএব আপনারা পূণ্যকর্ম আর সৎকর্ম সম্পাদন করুন। আপনারা যদি তা না করেন তাহলে মনে রাখবেন, যাবতীয় পার্থিব জিনিষ ক্ষণস্থায়ী। এই জাগতিক জড়বস্তুগুলোকে যারা প্রকৃত উপকরণ হিসেবে কিংবা জীবনের লক্ষ্য হিসেবে মনে করে তাদের মনে রাখতে হবে, এসব নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমি যে আয়াত

তেলাওয়াত করেছিলাম এতে এ কথাই বলা হয়েছে। **"মা ইন্দাকুম ইয়ানফাদু ওয়ামা ইন্দাল্লাহে বাক"** 'তোমাদের কাছে যা আছে তা ফুরিয়ে যাবে আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী' **"ওয়া লানাজযিয়ান্নাল্লাযিনা সাবারু আজরাহুম বেআহসানে মা কানু ইয়া'মালুন"** অর্থাৎ 'আর যারা ধৈর্য্যধারন করেছে আমরা তাদেরকে অবশ্যই তাদের সর্বোত্তম কৃতকর্ম অনুযায়ী উত্তম পুরস্কার দান করি।' আরো বলেছেন–পুরুষ বা নারী যে-ই বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করবে আমরা তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করে পুনঃজীবিত করে তুলবো আর তাদের সর্বোত্তম কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিব। অতএব ভালভাবে চিন্তা করুন, **এমন বোকা কি কেউ আছে যে ক্ষণস্থায়ী উপকরণ গ্রহণ করে চিরস্থায়ী পুরস্কার পরিত্যাগ করতে পারে?** ইহকালে কখনো কখনো পুণ্য ও পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য কষ্ট এবং দারিদ্রকে বরণ করতে হয়, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালন করতে গিয়ে কখনো কখনো বাহ্যিকভাবে নানা ধরনের কষ্ট সহ্য করতে হয়। অন্যদের অধিকার নিশ্চিত করতে গিয়ে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদেরকে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, তোমরা যদি এসব কষ্ট ও ত্যাগের পথ আমার সন্তুষ্টির জন্য পূণ্য কর্ম হিসেবে অবলম্বন কর তাহলে চিরস্থায়ী পুরস্কারের ভাগী হবে। জাগতিক কষ্টসমূহ ক্ষণস্থায়ী। তোমাদের ঈমান সুদৃঢ় রাখার জন্য আর বয়াতের অঙ্গীকার পূর্ণ করার নিমিত্তে কষ্ট স্বীকারের বদলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ সৃষ্টি করবেন। শর্ত হলো, তোমরা যেন অধৈর্য না হও। তা না হলে মনে রেখ, তোমাদের অধৈর্য্য মনোভাব ও অস্থিরতা আল্লাহ্ তা'লার বা বিশ্বাসীদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ক্ষতি হলে তোমাদেরই হবে। ঐশী নির্দেশাবলী অগ্রাহ্য করে তোমরা যা অর্জন করবে তা চিরস্থায়ী উপকার সাধন করতে অক্ষম। এ পার্থিব জীবন অতিক্রমকালেই এসবের কুপ্রভাব তোমরা প্রত্যক্ষ করবে। অতএব, আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে পুতঃপবিত্র ও সৎ কর্ম সম্পাদন করুন যেন ঐশী অঙ্গীকার অনুযায়ী আপনারা আপনাদের সর্বোত্তম আমল অনুযায়ী ঐশী পুরস্কারের ভাগী হন। আল্লাহ্ তা'লা তেলাওয়াতকৃত আয়াত দু'টিতে বলেছেন ঃ তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী। এবং যারা ধৈর্যধারন করে আমরা তাদেরকে অবশ্যই তাদের সর্বোত্তম কৃতকর্মের জন্য পুরষ্কার দান করব। যে-ই মোমেন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে সে পুরুষ হোক বা নারী, আমরা নিশ্চয় তাকে এক পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই আমরা তাদেরকে তাদের সর্বোত্তম কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিব।

তাই প্রতিটি আহমদী মহিলার দায়িত্ব, তিনি যেন দৃঢ়সংকল্প করেন, আমি জাগতিক খেলা-তামাশার মোহ, আকর্ষণ, ফ্যাশন আর বস্তুবাদিতার অন্ধ অনুসরণ করবো না। বরং চিরস্থায়ী জীবন লাভের উদ্দেশ্যে, ইহকালে এবং পরকালে জান্নাতের ভাগীদার হবার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করবো, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা বাস্তবায়ন করবো। আমরা যুগ-ইমাম অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বয়াত করেছি, অতএব তাঁর নির্দেশিত পথে চলবো। এই পদক্ষেপ কেবল আপনাকেই ঐশী নেয়ামত প্রদান করবে না, বরং আপনার সন্তানদেরকেও এই ঐশী নেয়ামতের অংশীদার করবে।

এ সমস্ত বিষয় যথাযথভাবে পালন করলে আপনারা নিজেরা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মও ইহকাল ও পরকালে ঐশী বরকতের ভাগী হবেন। আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার কখনো মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে না। মনে রাখবেন, শয়তান মানুষকে পদে পদে পথভ্রষ্ট করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর একাজ সে অনেক আগে থেকেই করে আসছে। শয়তান বিভিন্ন পথ ধরে মানুষের কাছে আসে আর মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়। তাই মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য দোয়া শিখিয়েছেন। আর বর্তমান কালে, 'আখারিন'দের যুগে, যে যুগে শয়তান কর্তৃক বিভিন্নরূপে কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষের অন্তরে আক্রমণ করার কথা ছিল, সে যুগে প্রত্যেক আহমদীকে **বিশেষভাবে আহমদী স্ত্রীদেরকে** আল্লাহ্ তা'লার কাছে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কেননা নিজ আহমদী সন্তানদেরকে সুরক্ষা করাও তার দায়িত্ব আর পরবর্তী প্রজন্মকে আগলে রাখার দায়িত্ব মহানবী (সাঃ) তাকেই অর্পন করেছেন। শয়তানের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তার অনেক বেশী দোয়া করা উচিত। **"মিনশাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস"** (অর্থাৎ, কুমন্ত্রণা দিয়ে পশ্চাদধাবনকারী শয়তানের অমঙ্গল থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই) বেশী বেশী পাঠ করা উচিত। কেননা বর্তমান যুগে শয়তানী, বিদ্রোহী আর দাজ্জালী শক্তিসমূহ মারাত্মক আক্রমণ চালাচ্ছে। এরা দুষ্টামী করে এমন সব ভয়ানক আক্রমন রচনা করছে যার পরিণাম চিন্তা করাও কঠিন।

বর্তমান যুগের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক যুবক-যুবতির মস্তিষ্কে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। স্মরণ রাখবেন, এভাবে আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়াকেও শয়তান ভুল পথে পরিচালিত করেছিল। আল্লাহ্ তা'লা একটি বিষয়ে নিষেধ করেছিলেন–শয়তান বললো, না, তোমরা একাজ করলে অন্যদের চেয়ে যেহেতু বেশী এগিয়ে যাবে, ফেরেশ্‌তাদের মত হয়ে যাবে এজন্য তোমাদের বারণ করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার চতুরতার কাছে মানুষ পরাস্ত হয় এবং নিজের ক্ষতি সাধন করে। বর্তমান যুগেও শয়তান বিভিন্নরূপে আপনাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে চলেছে। দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ, সুযোগ-সুবিধা ও জাগতিক বস্তুবাদিতার দিকে আপনাদেরকে আকৃষ্ট করে চলেছে। জগতের বিলাশ-বহুল জীবন যাপনের দিকে আপনাদের আকর্ষণ করে চলেছে।

কখনো জ্ঞান চর্চার নামে সে আপনাদেরকে উস্কে দিচ্ছে। অমুক বিষয়টি অবশ্যই অধ্যয়ন করা দরকার–একথা বলে উস্কে দিচ্ছে। কখনো সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভুল পেশা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করছে। আর এসব ভুল পেশার কারণে পরবর্তীতে কোন কোন স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানদের অধিকার খর্ব করে ফেলে। হযরত আদম এবং বিবি হাওয়া শয়তানের প্ররোচনায় ভুল করার পরে তাদের মধ্যে এক উপলব্ধি জন্মে। তাঁরা উপলব্ধি করেন, এটা আমাদের মস্ত বড় ভুল হয়েছে। আমরা শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অমান্য করার বিষয়টি তাদের কাছে প্রতিভাত হয়। আর তাদের এই অবাধ্যতার পরিণাম তারা অনুধাবন করেন এবং তখন হযরত আদম ও বিবি হাওয়া তাদের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আরম্ভ করেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন–**"ফাদাল্লাহুমা বেগুরুরিন ফালাম্মা যাকাতিশ শাজারাতা.....আদু'উম মুবিন।"** অর্থাৎ 'শয়তান তাদের উভয়কে প্ররোচনার মাধ্যমে পদস্খলিত করলো, অতএব তারা যখন সেই গাছের স্বাদ গ্রহণ করলো, তাদের দূর্বলতা তখন তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেল। আর তখন তারা উভয়ই জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদের দূর্বলতা ঢাকতে আরম্ভ করলো। আর তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বল্লেন–আমি কি তোমাদেরকে এই গাছের বিষয়ে সতর্ক করি নি আর তোমাদেরকে বলি নি, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?' তাই মনে রাখবেন, কোন বিষয় বাহ্যত সুন্দর দেখালেই এর পরিণামও যে উত্তম হবে এমন কোন কথা নেই। এমন অনেক জিনিষ আছে যা বাহ্যত খুব সুন্দর কিন্তু এর পরিণতি হয় ভয়ংকর। তাই ইহজীবনে অতি সতর্কতার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ নেয়া উচিত। আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আমাদের নিজস্ব পবিত্রতা ও মর্যাদাবোধ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চেয়ে প্রতিটি কাজ সম্পাদন করতে হবে এবং দোয়া করতে হবে। যেসব কাজ আল্লাহ্ তা'লা বারণ করেছেন সেসব বিষয়ে শয়তান বিভিন্নভাবে অবশ্যই প্ররোচিত করতে চেষ্টা করে। বিভিন্ন পন্থায় শয়তান মানুষকে প্ররোচিত করে। উদাহরণস্বরূপ–যুবতী মেয়েরা যারা ছাত্রী, তাদেরকে শয়তান এই বলে প্ররোচিত করে, অমুক বিষয়টিকে তুমি নিজের Subject হিসেবে বেছে নাও। জ্ঞান অর্জন করা অতি উত্তম কথা, অতি প্রয়োজনীয় কথা। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ধরুন, এমন একটি বিষয় রয়েছে যা অর্জনের পরিবেশ একটি মেয়ের জন্য যথোপযোগী নয়। এমন একটি বিষয় রয়েছে যে বিষয়ে পড়াশুনা করতে গেলে একজন আহমদী মেয়ের যথোপযোগী থাকার পরিবেশ নেই, কিংবা সেটি একটি অবাধ মেলামেশার জগত। সেখানে যখন একটি আহমদী মেয়ে মেলামেশা করবে তখন তার ওপর পরিবেশের কুপ্রভাব পড়াটা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। ধরুন, পিতা-মাতা কাছে ধারে নেই আর মেয়ে দূর-দূরান্তের কোন দেশে পড়তে গেছে। সেই স্বাধীন পরিবেশে তার হিজাব বা পর্দার অভ্যেস চলে যাবে। নানা রকম অবাধ মেলামেশা এক্ষেত্রে শুরু হয়ে যাবে। কখনো কখনো নেতিবাচক পরিবেশের প্রভাবে ভয়ংকর সব পরিণাম দেখা দেয়। যেমন, একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তা অস্থায়ী হলেও মেয়ের জীবনে চিরস্থায়ী কলংক হয়ে দাঁড়ায়। এর পাশাপাশি তার গোটা পরিবারের জন্য দূর্নামের কারণ হয়। পরিবারের জন্যও লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এই লজ্জাবোধের কারণে কোন কোন মেয়ের বাবা-মা জামাতের সাথে তাদের সম্পর্ক শিথিল করে ফেলেন। আহমদীয়া সমাজ ও পরিবেশের সাথে তাদের সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায়। এর পরিবর্তে তারা নিজেদেরকে এমন এক সমাজের সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলেন যেখানে বস্তুবাদিতা ও দুনিয়াদারী ছাড়া আর কিছু নেই। তাদের অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও এ একই দুনিয়াদারীতে ডুবে যায়। আর সেই ছেলে আর মেয়ের সম্পর্ক যদি স্থায়ী বিয়েতে রূপান্তরিত হয়, ছেলে আহমদী না হলে সন্তানরাও আর আহমদী থাকে না। জীবনের এক পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এই উপলব্ধি জন্মায়, যৌবনের উন্মাদনায় আমরা শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকারে পরিণত হয়েছিলাম। কখনো কখনো পিতা-মাতা তাদের সন্তানের মন রক্ষার্থে অথবা সন্তানের আবেগ লক্ষ্য করে বলে থাকেন, অমুসলিম ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে ক্ষতি কি! এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর এদের চেতনা জাগ্রত হয়–আমরা মস্ত বড় ভুল করেছি। এতে একটি গোটা আহমদী প্রজন্মই নষ্ট হয়ে যায়। এটা একটা ভয়ংকর রূপ যা আমি বর্ণনা করছি। একটি ভুল পদক্ষেপের কারণে একটি পুরো পরিবার আহমদীয়াত ত্যাগ করে শয়তানের আয়ত্তে চলে যায় এবং ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। আরেক ধরণের ফলাফল দেখতে পাওয়া যায়। সেটা হলো, জীবনের এক বড় অংশ কাটানোর পর মেয়ে এবং মেয়ের পিতা-মাতা অনুধাবন করতে আরম্ভ করে, তার ইচ্ছে পূরণের তাগিদে আমরা যে পদক্ষেপ নিয়েছিলাম তা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর ফলশ্রুতিতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম ধর্ম এবং খোদা তা'লা থেকে দূরে সরে গেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা অর্জন করা একটি বৈধ এবং একটি প্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু এটা অর্জন করতে গিয়ে, তথাকথিত মুক্ত চিন্তার ফলশ্রুতিতে, মেয়েদের নিষ্কলুষ ও পবিত্র জীবন যাপনের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত শর্তাবলী পালন না করে শয়তানের প্ররোচণায় স্বঘোষিত স্বাধীনতা অবলম্বন করে এরা কী ফল পেল? বরং একটি বৈধ কাজের অনুচিত বাস্তবায়ন এদের জীবনে মন্দ পরিণাম সৃষ্টি করলো আর এ মন্দ পরিণাম একটি বৈধ কাজকেও অসৎ কর্ম বলে সাব্যস্ত করলো।

বিয়ে করাটা একটা ধর্মীয় বিধান। কিন্তু যে বিয়ে পরিণামে ধর্ম বিমুখ করে তাকে সৎকর্ম বলা যায় না। একইভাবে, যে সকল আহমদী ছেলেরা নিজেদের পছন্দের অমুসলিম কিংবা অ-আহমদী মেয়ে বিয়ে করে, তারা যদি নিজ স্ত্রীদের আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলামে প্রতিষ্ঠিত না করে তাদের বিয়েও সৎ কর্ম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। অতএব প্রত্যেক বৈধ কাজ যে সবার ক্ষেত্রে সৎকর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে–এমন নয়। তাই এসব বিষয়ে অভিভাবকদের এবং আহমদী যুবক-যুবতীদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি, এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী দু'একটা ঘটনা ঘটে থাকে যার ফলে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ঘটনাগুলো যদিও ব্যতিক্রমধর্মী, কিন্তু নিঃসন্দেহে এসব ঘটনা দুঃশ্চিন্তার কারণ। কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, এছাড়াও কিছু ঘটনা ঘটে থাকে। যেমন, কর্মক্ষেত্রে একসাথে কাজ করার দরুন কিংবা পরিবেশ-পরিস্থিতির মন্দ প্রভাবের কারণে অথবা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার ফলশ্রুতিতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যাতে তারা অপারগ হয়ে যায় অথবা নিজেদরকে অপারগ বলে মনে করে। কোন কোন আহমদী মেয়ে তার 'স্বাধিকারের' ছত্রছায়ায় বাইরে বিয়ে করে ফেলে এরপর যুক্তি প্রদর্শন করা হয় "আহলে কিতাবের সাথে বিয়ে করা বৈধ"। একথা ঠিক, এর অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এটাও স্মরণ রাখতে হবে, আহলে কিতাবকে মুশরিকদের দলভুক্ত করে আল্লাহ্ তা'লা অবিশ্বাসী বলেও আখ্যা দিয়েছেন। এদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তোমরা নিজেদের বিনষ্ট করে ফেলবে এটাও আছে। অতএব, এসব কথা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার বিষয়। পরবর্তীতে হায়-হুতাশ করে কোন লাভ নেই। এ ধরণের মানুষ পরিণামে নিজেরাও অশান্তিতে ভোগে এবং আমাকেও চিঠি লিখে অস্থির করে। তাই সবসময় এ ধরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে আবেগের পরিবর্তে দোয়ার ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন এমন একটি বিষয় যা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এবং দোয়ার মাধ্যমে সম্পাদন করা উচিত। তাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা যখন বিয়ে করার চিন্তাভাবনা কর, তখন ধন-সম্পদ দেখবে না, রূপ-সৌন্দর্য দেখবে না, বংশ-গৌরব ও মর্যাদা দেখবে না। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো 'ধার্মিকতা'। আমরা যদি এই মানদন্ড অবলম্বন করতে পারি এবং একে বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে দেখবেন আমাদের সমাজ কেমন একটি পবিত্রচিত্ত-বিশিষ্ট লোকদের সমাজে পরিণত হয়।

অতএব, সবসময় মনে রাখবেন, এক আহমদী মেয়ের কিংবা মহিলার একটি নিজস্ব সম্মান ও পবিত্রতা রয়েছে। এই সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা তার দায়িত্ব। এমন কোন কাজ করবেন না যা আপনাকে ধর্মবিমুখ করে, এমন কোন কাজ করবেন না যার পরিণতিতে আপনার সম্মান ও পবিত্রতার গায়ে আঁচড় লাগে।

মহিলাদের চাকুরী করার প্রয়োজন হতে পারে। চাকুরী করা নিষিদ্ধ নয়। শিক্ষা অর্জন করা নারীদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এসব স্বাধীনতার এমন অপপ্রয়োগ নিষিদ্ধ যার ফলশ্রুতিতে মন্দ ফলাফল প্রকাশিত হয়। তাই এমন চাকুরী করা বা পড়াশুনার ক্ষেত্রে মেয়েদের এমন বিষয় বা সাবজেক্ট মনোনীত করা উচিত যা নিজের জন্যও উপকারী সাব্যস্ত হয় আবার মানবতার জন্যও উপকারী হয়। আমি উদাহরণস্বরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। যেমন ঃ Geology অর্থাৎ ভূতত্ত্ব। নিঃসন্দেহে জ্ঞানের একটি প্রয়োজনীয় শাখা। কিন্তু এর জন্য বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। গবেষণার উদ্দেশ্যে টানা কয়েকদিন উন্মুক্ত স্থানে অবস্থান করতে হয়। এ ধরণের জ্ঞান অর্জন করতে গেলে নিজেরও দুঃশ্চিন্তা থাকে এবং অভিভাবকদেরও দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকতে হয়। তাই এ ধরণের বিষয় নির্বাচন না করে মহানবী (সাঃ)-এর বর্ণিত জ্ঞানের শাখায় বিচরণ করা শ্রেয়। অর্থাৎ 'ইলমুল আবদান' ও 'ইলমুল আদিয়ান' (দেহ শাস্ত্রের জ্ঞান এবং ধর্মীয় জ্ঞান)। আহমদী মেয়েরা সাধারণত পড়াশুনায় মেধাবী হয়ে থাকে। তারা ডাক্তারী বিদ্যা অর্জন করতে পারে। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি আহমদী নারী ও পুরুষের জন্য আবশ্যক। এতে মানবজাতির যেমন সেবা করা সম্ভব তেমনই নিজ সন্তান-সন্ততির উপকারও করা সম্ভব। মেয়েদের ক্ষেত্রে ভাষা শিক্ষাও একটি ভাল কাজ। এতে অনেক লাভ হবে। জামাতও লাভবান হবে, এ সমস্ত মহিলা অনুবাদকের মাধ্যমে জগতও উপকৃত হবে, আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও উপকার হবে। অতএব আহমদী মেয়েদের এমন সব বিষয় নির্বাচন করা উচিত, যা তাদের নিজের জন্য, মানবজাতির জন্য ও সন্তান-সন্ততির জন্য উপকারী সাব্যস্ত হয়। ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এতে বাজে কথার আসর, গল্প গুজবের বৈঠক, হাসি-তামাশার বদ অভ্যাস থেকে মানুষ নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে। পার্থিব আলাপ-আলোচনা, নিজের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কিংবা অন্যের স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যক্ষ করে হিংসায় জ্বলে মরা–এসব বদ অভ্যাস শেষ হয়ে যাবে। প্রত্যেক আহমদী মহিলা যদি নিজের মাঝে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মতো বৈপ্লবিক মন-মানসিকতা সৃষ্টি করে ফেলেন এবং নিজের মাঝে সর্বক্ষেত্রে সৎকর্ম সম্পাদনের অভ্যাস গড়ে তুলেন তাহলে কত দ্রুত আহমদীয়াত পৃথিবীতে বিস্তৃত হয় তা আপনারা প্রত্যক্ষ করবেন।

এ যুগে জগতবাসীর সামনে জীবন্ত খোদার পরিচয় তুলে ধরা আবশ্যক। এরই মাঝে জগতের স্থিতি নির্ভরশীল। তাই সর্বপ্রথম নিজেদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলুন যেন আপনাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিবেদিত হয়। আপনারা বিশ্ববাসীকে যেন একথা বলতে পারেন, 'দেখ, এ পরিবর্তন আমাদের মাঝে সৃষ্টি হবার কারণ হলো, আমরা সেই শেষ শরীয়ত গ্রন্থের অনুসারী যা মহান আল্লাহ্ আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। তোমরাও যদি

তোমাদের খোদার সাথে সাক্ষাত লাভ করতে চাও, তোমাদের মনের অশান্তি ও অস্বস্তি দূরীভূত করতে চাও, তাহলে এদিকে এসো। তোমরা এ পথে এসো আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। সে তোমাদেরকে কুপ্ররোচনা দিচ্ছে, সে তোমাদেরকে জাগতিক সুযোগ সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে পদস্খলিত করছে। তোমরা কি মনে কর, এ পার্থিব জগত পরকালে কোন কাজে লাগবে? এসব পার্থিব ও জাগতিক কর্মকান্ড তোমাদেরকে বরং জাহান্নামের দিকে ধাবিত করবে। কেবল নেক আর পূণ্যবান কাজকর্মই জান্নাতে যাবার এবং ইহকালে মনের প্রশান্তি লাভ করার পথ প্রশস্থ করে।' আপনারা যদি এভাবে জগতকে সত্য ও সুন্দরের দিকে আহ্বান জানান তাহলে একদিকে আপনারা যেমন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করবেন অপরদিকে নিজের সন্তান-সন্ততিদের বিষয়ে একথার নিশ্চয়তাও লাভ করবেন যে তারা নেক কাজে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং থাকবে। কিন্তু এ কাজের জন্য নিজের মাঝে সৎকর্ম করার প্রবণতা প্রথমে সৃষ্টি করতে হবে–এ কথা আমি আগেই বলে এসেছি। অতএব, আপনারা আপনাদের ইবাদতের মান উন্নত করতে সচেষ্ট হোন এবং আল্লাহ্ তা'লার অন্যান্য আদেশাবলী পালনেও যত্নবান হোন।

এ শী আদেশাবলীর মধ্যে **পর্দা পালন বা হিজাবের** শিক্ষাও একটি। আল্লাহ্ তা'লা মহিলাদের সম্মান ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠার জন্য এ আদেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"ওয়ালা ইউবদিনা যিনাতাহুন্না ইল্লা মাযহারা মিনহা"** অর্থাৎ 'তারা যেন নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে না বেড়ায়। তবে যা আপনা আপনি প্রকাশিত হয় তার কথা ভিন্ন।' এর মাধ্যমে বলা হয়েছে, পোশাক-পরিচ্ছদ এমন হতে হবে যার কারণে দেহের নগ্নতা প্রকাশ না পায়। কেউ যদি Jeans এবং ব্লাউজ পরিহিত অবস্থায় বেড়িয়ে পড়েন তাহলে এটা সঠিক নয়। কোন কোন মা নিজ কন্যা সন্তানদের দিকে এ বিষয়ে মনোযোগ দেন না। মেয়ের বয়স ১২/১৩ বছর হয়ে গেলে পোষাকের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। এরপর আরেক স্থলে আল্লাহ্ বলেছেন, "ওয়াল ইয়াযরিবনা বেখুমুরিহিন্না আলা জুয়ুবিহিন্না" অর্থাৎ 'তারা তাদের গায়ের চাদর তাদের বুকের ওপর দিয়ে ঢেকে পরিধান করবে।' হিজাব বা পর্দা এমন একটি বিষয় যে বিষয়ে কুরআন শরীফে নানা আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে। এদিকে আহমদী মহিলা ও মেয়েদের বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। যে সব কর্মের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা নিজে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন সেগুলো যে সৎকর্ম এ প্রসঙ্গে কোন আহমদী মহিলার মস্তিষ্কে কোন সন্দেহ থাকতেই পারে না। একজন বিশ্বাসী মহিলার অন্তরে এ বিষয়ে মোটেই সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আর এসব আদেশের ক্ষেত্রে আমল করতে বিন্দু পরিমাণ দ্বিধা থাকাও উচিত না।

আমি লক্ষ্য করেছি, পাকিস্তান থেকে Asylum লাভকারী কিংবা জলসায় যোগদানকারী মহিলাদের ক্ষেত্রেও আজকাল আমি দেখেছি। জানি না কোন্ হীনমন্যতার কারণে, তারা কেন জানি Airport-এ নেমেই নিজেদের নেকাব নামিয়ে ফেলেন। এর পরিবর্তে তারা যে ছোট চাদর বা স্কার্ফ নেন তা তাদের পূর্ণাঙ্গীন হিজাব পালনের জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়। কিছুক্ষণ পর পর তা আপনা-আপনি মাথা থেকে ঢলে পড়ে যায়। তদুপরি তাদের মুখে Make up-ও করা থাকে। কোন মহিলা যদি এমন কোন পেশায় নিয়োজিত থাকেন যেখানে পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মুখ মন্ডলে নেকাব রাখা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে তিনি এমন স্কার্ফ ব্যবহার করতে পারেন যার দ্বারা সর্বাধিক মুখমন্ডলের পর্দাও বজায় থাকে আর কাজেও বিঘ্ন না ঘটে। সেক্ষেত্রে মুখে পূর্ণ মেক আপও রাখা যাবে না। কিন্তু যিনি একজন গৃহিনী, পাকিস্তানে পর্দায় অভ্যস্ত থাকা অবস্থায় তিনি এখানে এসেছেন–এখানে (যুক্তরাজ্যে) এসে যদি তিনি নেকাব নামিয়ে ফেলেন এবং Make up-ও করেন–এটা কোনমতেই সৎকর্ম হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না। এ ধরণের মহিলার বিষয়ে এ কথা বলা যেতে পারে, তিনি পার্থিবতার ওপর ধর্মকে প্রাধান্য না দিয়ে বরং ধর্মের ওপর পার্থিবতাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। তিনি সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির কুপ্রভাবে বেশী প্রভাবান্বিত হচ্ছেন। ইউরোপে জন্মগ্রহণকারী মেয়েরা এবং মহিলারা কোন কোন ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সমাজে লালিত-পালিত মহিলাদের চেয়ে ভাল পর্দা করছেন এ দৃশ্য দেখে কখনো কখনো লজ্জা পেতে হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এদের মার্জিত পোষাক-পরিচ্ছদ হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান থেকে আগত মহিলাদের চেয়ে ভাল হয়ে থাকে। সেখানে (অর্থাৎ উপমহাদেশে) তারা যে বোরকা পরিধান করেন, এখানে এসে যদি তা স্বামীদের কথায় নামিয়ে ফেলেন সেক্ষেত্রেও তারা ভুল করছেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট আদেশাবলীর বিপরীত স্বামীর কোন কথা গ্রহণীয় নয়। আর মহিলারা যদি নিজ উদ্যোগে এমন করে থাকেন সেক্ষেত্রে পুরুষদের জন্য এটা একটা লজ্জাকর বিষয়। এদের নিজ স্ত্রীদেরকে বুঝানো উচিত ছিল, তোমাদের একটি নিজস্ব সম্মান ও পবিত্রতা রয়েছে, এর সুরক্ষা কর। পর্দাপ্রথাকে বাদ দিও না। অতএব, সবধরণের হীনমন্যতা পরিত্যাগ করুন। নারী পুরুষ উভয়কে মনের পবিত্রতা নিয়ে এ কাজ (অর্থাৎ হিজাব বা পর্দার সুরক্ষা করা) উচিত। হীনমন্যতার শিকার নারী-পুরুষ উভয়কে অন্য ধর্ম থেকে আগত নও-মুসলিম আহমদী মহিলাদের আচরণ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। যেক্ষেত্রে তারা অন্য ধর্ম থেকে এসে পরিমার্জিত শালীনতাপূর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করছেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত আদেশাবলীকে পালন করার চেষ্টা করছেন, সেক্ষেত্রে আপনারা (পুরোনো আহমদী হওয়া সত্ত্বেও) হিজাব পরিত্যাগ করে কীভাবে হালকা বা সংক্ষিপ্ত পোষাক অবলম্বন করছেন যা ধীরে ধীরে আপনাদেরকে

সম্পূর্ণ বেপর্দা করে ছাড়বে! ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করার ফলশ্রুতিতে যেক্ষেত্রে সে জ্ঞানের বাস্তবায়ন বেশী হওয়া প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে তা থেকে দূরে সরে যাওয়া অজ্ঞতার গভীর খাদে নিক্ষিপ্ত হবারই নামান্তর। একটি আদেশ অমান্য করার পর আরেকটি ঐশী আদেশ পালনের ক্ষেত্রে অলসতা দেখা দেয়। এরপর সন্তান-সন্ততিদের মাঝে ধর্ম থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এরপর ধীরে ধীরে সমস্ত পরিবারই ধর্ম বিমুখ হয়ে যায় আর ধ্বংস হয়ে যায়। **তাই একটি ঐশী আদেশকেও কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করবেন না।** ইস্তিগফারসহ আল্লাহ্‌র কাছে বিনত হন যেন একদিকে আপনারা নিজেদের রক্ষা করতে পারেন, অপরদিকে আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। এর পাশাপাশি নবদীক্ষিত আহমদীদেরকেও পরীক্ষার কবল থেকে যেন রক্ষা করতে পারেন। আমি আগেই বলে এসেছি, **আপনাদের সৎকর্মসমূহ আপনাদের তবলীগের ক্ষেত্রে, আগামী প্রজন্মকে যথাযথ তরবীয়ত প্রদানের ক্ষেত্রে এবং নতুনদের খাঁটি আহমদী হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।**

অতএব আপনারা সবাই (অর্থাৎ আহমদী যুবতী এবং মহিলারা) সকলে নিজেদের অন্তরে সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কত মহান শিক্ষার অধীনস্থ করেছেন, আমাদের দ্বারা কত বড় শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করাতে চান, আমাদের মাঝে কত উচ্চ মার্গের স্পৃহা সৃষ্টি করতে চান আর আমরা নিজেরা কতটুকু সেই শিক্ষার বাস্তবায়ন করতে পেরেছি! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামাতে যোগদান করে, তাঁর হাতে বয়াতের অঙ্গীকার করার পর আমরা তা বাস্তবায়নে কতটুকু সচেষ্ট? আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে এই আন্তরিকতা কতটুকু সৃষ্টি করতে পেরেছি? আজ জগতের পরিত্রাণ আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী বাস্তবায়নে আর মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ বাস্তবায়নের মাঝে নিহিত। জগতকে এই সুন্দর পথে একত্র করতে আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে যাতে সৎকর্মের ফলশ্রুতিতে বিশ্বের নৈরাজ্যময় বিশৃংখলা দুরীভূত হয়। কুরআন শরীফ একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও জীবন বিধানের নাম। এর শিক্ষা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করুন। **কোন ধরণের হীনমন্যতায় ভুগবেন না।** এ শিক্ষাকে নিজেরা বাস্তবায়ন করে জগদ্বাসীকে এ শিক্ষার দিকে আহ্বান জানান। এমন উচ্চাঙ্গের জীবনাদর্শ ও আচরণ তুলে ধরুন যেন অন্য জাতির মহিলারা আপনাদের কাছে এসে দিক-নির্দেশনা লাভ করেন। জগতের মহিলারা আপনাদের কাছে এসে যেন জিজ্ঞেস করেন, 'আমরা জাগতিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চার কোন কোন ক্ষেত্রে যদিও আপনাদের চেয়ে এগিয়ে আছি, আমরা বাহ্যত এক স্বাধীন পরিবেশে জীবন যাপন করছি, এসব সত্ত্বেও আমরা মনের প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারিনি। আমাদের মাঝে এক অস্বস্তি বিরাজ করছে। আমাদের পরিবার ও সংসার ছারখার হয়ে চলেছে। দাম্পত্য জীবনে কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিরোধ ক্রমেই বেড়ে চলেছে যার কারণে সন্তান-সন্ততিদের জীবনও প্রভাবিত হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের পারিবারিক জীবন আমাদের পারিবারিক জীবনের চেয়ে ভিন্ন প্রতীয়মান হচ্ছে। তোমাদের পারিবারিক জীবন সৌহার্দ্য ও শান্তিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। আমরা তোমাদেরকে নিজেদের জন্য Model বা আদর্শ বলে মনে করি। আমাদেরকে বল, আমরা এই শান্তি ও স্বস্তি কীভাবে অর্জন করতে পারি?' তখন আপনারা তাদেরকে বলবেন, 'আল্লাহ্ তা'লা যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা তা ভুলে বসেছো। তোমাদের পুরুষ বা মহিলা কেউই সে শিক্ষা বাস্তবায়ন করছে না। আর জীবনের সেই মূল উদ্দেশ্য হলো, এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র উপাসনা করা আর তাঁরই উদ্দেশ্যে সৎকর্ম সম্পাদনা করা। এবং এটা কেবল খাঁটি ইসলাম ধর্মে তোমরা লাভ করতে পারো। আমাদের ধর্মে স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীর সংসারের তদারকি ও তার সন্তান-সন্ততিদের সুরক্ষা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের জীবন্ত খোদাকে চিনতে না পারবে আর নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হবে তোমরা শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পার না। আর তোমরা যারা নিজেদেরকে সবচেয়ে সুসভ্য বলে মনে কর তোমাদের যে এক জীবন্ত খোদা আছেন তা তোমরা ভুলে বসেছো।'

অতএব হে আহমদী মহিলারা! আপনারা নিজেদের মাঝে কোন ধরণের হীনমন্যতাকে স্থান না দিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করুন। নিজ ধর্মশিক্ষাকে সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গীন হিসাবে বিশ্বাস করুন। কুরআন শরীফের শিক্ষার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিন, একে বাস্তবায়িত করুন। তাহলে আপনারা ইনশাল্লাহ্ জগতকে নেতৃত্বদানের ভূমিকা পালন করবেন। আর তা না করে যদি কেবল জগতের মোহ ও চাকচিক্যের পেছনে ছোটাছুটি করেন তাহলে নিঃসন্দেহে জানবেন, এ সবকিছু ফুরিয়ে যাবে আর পরিণামে হায়-হুতাশ ও আক্ষেপ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকবে না। **আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী তাঁকে এমন সব জাতি দান করবেন যারা ইসলাম ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি আশা করি, এই গৌরব সেই সব পুরোনো আহমদী পরিবারগুলো এবং সেই সমস্ত আহমদী মহিলারাই লাভ করবেন যারা কষ্টের যুগে আহমদীয়াতকে গ্রহণ করেছিলেন।** আপনারা নিজেদের এই দায়িত্ববোধকে কখনো ম্লান হতে দেবেন না। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে এর সৌভাগ্য দান করুন। অতএব, আল্লাহ্ প্রদত্ত এই মহান অনুগ্রহকে যথাযথভাবে মূল্যায়ণ করুন। আপনাদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আল্লাহ্ তা'লার আদেশ মান্য করার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। আপনারা এমন প্রজন্ম রেখে যাবেন যারা পরবর্তীতে তাদের প্রজন্মের মাঝেও আল্লাহ্‌র ধর্মের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করার কাজ অব্যাহত রাখবে। এমনই যেন হয়, আমীন।

অনুবাদ ঃ **আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী**
ওয়াকেফে জিন্দেগী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র

(মকতুবাতে আহ্মদীয়া, ৫ম খন্ড)

সংকলক- হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ)

(একাদশ কিস্তি)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এর নামে

পত্র নং ১

(জনৈক পাদ্রী সাহেবের নামে)

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

বা'দা মা ওজাব। ডাকযোগে আপনার তারিখবিহীন পত্রখানা আমি পেয়েছি। এতে আপনি শুরুতেই অপ্রাসঙ্গিকভাবে এ কল্পকাহিনীর কথা তুলে দিয়েছেন যে, প্রকৃতপক্ষে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ও মালিক সর্বশক্তিমান খোদা হলেন হযরত মসীহ্ এবং তিনিই নাজাতদাতা (পরিত্রাতা)। কিন্তু আমি চিন্তা করি, একজন ভৌতিক দেহের আদম সন্তান, বিনীত ও অক্ষম বান্দার সম্পর্কে আপনারা ধারণা করে বসেন সে-ই কিনা আপনাদের সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্ব প্রতিপালক, এটা কি করে আপনাদের মনঃপূত হয়ে যায়? এতে কী করে আপনাদের প্রবৃত্তি সায় দেয়? হযরত মসীহ্র সম্পর্কে আপনাদের এমনটি ধারণা করা ঠিক তেমনই, যেমন হিন্দুরা রাজা রামচন্দ্র সম্পর্কে ধারণা করে থাকে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, হিন্দুরা কৌশল্যার ছেলেকে তাদের পরমেশ্বর বানাচ্ছেন। আপনারা হযরত মরিয়মের পুত্রকে বানাচ্ছেন।

রামচন্দ্র বা কৃষ্ণ আকাশ ও পৃথিবীর কোন এক কণা পরিমাণও সৃষ্টি করেছেন বলে হিন্দুরা যেমন কখনও প্রমাণ করে দেখাননি তেমনি আজ পর্যন্ত আপনারাও হযরত মসীহ্র সম্পর্কে এর কোন প্রমাণ দেখাননি। আক্ষেপ! মেধা, বিবেকবুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণ সূক্ষ্মচিন্তা বোধ ও মনন-এর সহজাত যে-সব শক্তি ও ক্ষমতায় আপনাদের প্রকৃতিকে ভূষিত করা হয়েছিল আপনারা সেগুলোর এক কণা পরিমাণও কদর ও মূল্যায়ণ করেননি। আর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনাদি পড়ে ও চর্চা করেও সবই ডুবিয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যার আলো আপনাদের হৃদয়কে একটুও ছুঁতে পারেনি। সরলতা ও অজ্ঞতার যুগের মনগড়া বিষয়গুলোকেই আপনারা এখন পর্যন্ত নিজেদের জীবন বিধান বানিয়ে রেখেছেন। হায়! হযরত মসীহ্, রাজা রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব ইত্যাদি যাঁদের সৃষ্টিপূজারী লোকেরা খোদা বানিয়ে রেখেছে, তাঁরা যদি এ যুগে দু'/চার দিনের জন্য দুনিয়াতে নিজেদের দর্শন দিয়ে যেতেন(!) যাতে এ লোকদের অন্তরে নিহিত সহজাত বিচারশক্তি এদের অভিযুক্ত করতো, 'এই আদম সন্তানদের কি খোদা বলে ডাকা উচিত!' অদ্ভুত ব্যাপার যে আপনাদের বিশ্বাসে পুঞ্জিভূত এ যাবতীয় লাঞ্ছনা সত্ত্বেও আপনারা আবার দাবী করেন আপনাদের এসব বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত! আমি অবাক হচ্ছি, খোদা কিনা তাঁর আদি ও অপরিবর্তনীয় প্রতাপ (জালাল) পরিত্যাগ করে এক নারীর গর্ভে অবতরণ ও নাপাক পথে জন্মগ্রহণ করেছেন ও দুঃখ-কষ্ট সয়েছেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। কেবল তাই নয় বরং তিনি তিনজনও, আবার একজনও। তিনি পূর্ণমানবও, আবার পূর্ণ খোদাও। যারা এসব বিশ্বাস রাখেন তারা তাদের এ জাতীয় বিশ্বাসকে কী করে যুক্তিযুক্ত বলে সাব্যস্ত করতে পারেন? এমন দর্শন কোন্‌টি যার মাধ্যমে তারা এসব আজে বাজে কথাকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতিপন্ন করতে পারেন?

আবার এ-ও লক্ষ্য করা গেছে, আপনারা যখন নিজেদের খেয়াল-খুশি মত গড়া বিশ্বাসের সত্যতা যুক্তিগতভাবে প্রমাণ করতে পারেন না তখন নিরুপায় হয়ে শাস্ত্রীয় বিবরণে রূপ কথার দিকে ধাবিত হন এবং বলেন, 'এসব বিষয় আমরা বাইবেলে দেখেছি।' কিন্তু এ উত্তরটি ও সম্পূর্ণ অবান্ত র ও অর্থহীন। কেননা এসব পুস্তকে কখনও এ কথা লিপিবদ্ধ নেই যে, হযরত মসীহ্ খোদার (জাত) পুত্র অথবা তিনি স্বয়ং 'বিশ্ব প্রতিপালক' (রাব্বুল আলামীন) এবং অন্য সব মানুষ তাঁর বান্দা। বরং বাইবেলে গভীর মনোনিবেশকারী মাত্র ভালভাবে জানেন, খোদার পুত্র বলে কাউকে ডাকা–এটা এসব পুস্তকের সাধারণ বাগধারা। বরং কোন কোন জায়গায় 'খোদার কন্যাগণ'ও লিখা আছে। আর এক জায়গায় এ-ও লিখা আছে ঃ 'তোমরা সবাই খোদা।' অতএব এমতাবস্থায় হযরত মসীহ্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কী থাকলো?

তাছাড়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্র জানেন, কিতাবের বিবরণ ও খবরাদিতে সত্য ও মিথ্যা এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের কিতাবাদি যে পরিমাণ আঘাতগ্রস্ত হয়েছে এবং যে-সব খিয়ানত ও প্রক্ষেপের বিষয় তারা নিজেরা স্বীকার করে নিয়েছেন–এ সব কারণে উক্ত সম্ভাবনা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে পড়ে।

আর এ-ও আপনাদের চিন্তা করা উচিত, যথাযথ প্রমাণ ছাড়া প্রত্যেক লেখা যদি নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হতে পারে, তাহলে আবার আপনারা সেই সব গালগল্পকে কেন নির্ভরযোগ্য মনে করেন না, যা হিন্দুদের পুস্তকাদিতে রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইত্যাদির অলৌকিক কান্ড ও তাদের বড় বড় কীর্তি সম্পর্কে লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। যেমন, মহাদেবের কেশকুন্ডলি থেকে গঙ্গানদ নির্গত হওয়া, মহাদেবের পাহাড় উত্তোলন করা।

আর তেমনি অর্জুনের ভাই রাজা ভীমের মোকাবেলায় মহাদেবের কুস্তির জন্য আসা। এ সম্পর্কে পুরাণে এ কল্পকথা লিখা আছে যে, মহাদেবজী মালঞ্চের রূপ ধারণ করে রাজা ভীমের সামনে এসে দাঁড়ান। ভীম তার সঙ্গে লড়তে চান। কিন্তু মহাদেবজী দৌড়ে পালালেন। ভীম তাকে ধাওয়া করলো। তখন (মালঞ্চের রূপধারী) মহাদেব মাটির নীচে ঢুকে গেলেন। এটা দেখে ভীম সজোরে তার লেজ ধরে ফেললেন এবং বললেন, 'এখন আমি আর যেতে দেবো না।' সুতরাং লেজ ও শরীরের পেছন অংশ তো ভীমের হাতের মুঠোয় থেকে গেলো এবং মুখ নেপালের পাহাড়ে গিয়ে বেরুলো। এ কারণে মুখের পূজা নেপালে হয়ে থাকে। এবং লেজ ও দেহের পেছনের অংশের পূজা কেদার নাথে অনুষ্ঠিত হয়। এখন লক্ষ্য করুন, যে আকীদা-বিশ্বাস আপনারা বানিয়ে রেখেছেন–অর্থাৎ খোদাতাআলার রূহ্ (আত্মা) হযরত মরিয়মের গর্ভে প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করার পর সেটি এক নতুন রূপ ধারণ করে' (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ হয়ে যায় –অনুবাদক)। এর ফলে তিনি পরিপূর্ণ খোদা বনে যান। আবার পূর্ণ মানবও হয়ে যান। এ কল্পকাহিনীটি কি ভীম ও মহাদেবের কল্পকাহিনীর চেয়ে কোন অংশে কম?

তারপর আপনারা এ-ও দাবী করেন যে, মসীহ্র প্রায়শ্চিত্তে ঈমান রাখায় আপনাদের নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি আপনাদের মাঝে নাজাত বা পরিত্রাণের কোন আলামত ও লক্ষণ দেখতে পাই না। যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তাহলে আপনারা আমাকে দেখিয়ে দিন, ঐশী গ্রহণযোগ্যতার জ্যোতি, আশিস ও বরকত-এর কী কী নিদর্শন আপনাদের মাঝে দেখা যায়, যেগুলো থেকে অন্যান্য লোক বঞ্চিত হয়ে আছেন? আমি এটা মানি, ঈমানদার ও বেঈমান এবং নাজাতপ্রাপ্ত ও অ-নাজাতপ্রাপ্তদের মাঝে অবশ্যই স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। কিন্তু পাদ্রী সাহেব! আপনি নারাজ হবেন না। যে-সব আলামত ও লক্ষণ ঈমানদারদের মাঝে হয়ে থাকে এবং হওয়া উচিত যেগুলো হযরত মসীহ্ আলাইহিস সালামও ইঞ্জিলের দু/তিন জায়গায় লিখেছেন সেগুলো আপনাদের মাঝে আমি খুঁজে পাই না। বরং সে সব আলামত ও লক্ষণ সত্যিকার মুসলমানদের মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। আর সদা সর্বদা তাদের মাঝে দেখতে পাওয়া গেছে। আর সে-সব আলামত ও নিদর্শনই প্রকাশিত করার উদ্দেশ্যে এ অধম আপনাদের খিদমতে রেজিষ্ট্রীকৃত পত্র দিয়েছে ও বিশ হাজার ইস্তেহার (প্রচারলিপি) বিতরণ করেছে। এর পূর্ণ প্রচার ও 'ইতমামে হুজ্জত' তথা যুক্তি-প্রমাণের পূর্ণতা সাধনের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করা হয়নি যাতে খোদার কৃপায় সত্য অনুধাবন ও অবলোকনের জন্য আপনারা উৎসাহিত হন। খোদার কাছে গ্রহণীয় ও প্রত্যাখ্যাতদের মাঝে যে পার্থক্য থাকা উচিত তা যেন আপনারা স্বচক্ষে দেখেন আর যাতে উত্তম বৃক্ষের উত্তম ফল ও ফুল আপনারা নিজেরা দেখে নেন। কিন্তু আফসোস, আমার এত চেষ্টা-প্রচেষ্টায় আপনাদের মাঝ থেকে কোন একজনও ময়দানে বেরিয়ে এলেন না। এখন আপনি চিঠি লিখেছেন। দেখা যাক, এর কী পরিণাম হয়।

আপনি আপনার চিঠিতে তিনিটি শর্তের কথা লিখেছেন। প্রথমে আপনি লিখেছেন, ছয় শ' টাকা অর্থাৎ তিন মাসের বেতন আপনাদের কাছে গুজরাঁওলায় অগ্রিম পাঠানো হোক। এ ছাড়া বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থার দায়িত্ব এ অধমের ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং এতে কোন প্রকার অসুবিধা বোধ করা মাত্র তৎক্ষণাৎ আপনি গুজরাঁওলা ফিরে যাবেন। আর যে টাকা (অগ্রিম) পেয়ে থাকবেন তা এ অধমের ফেরৎ পাওয়ার অধিকার থাকবে না। এ হলো প্রথম শর্ত যা আপনি লিখেছেন। কিন্তু বিনীতভাবে নিবেদন করা যাচ্ছে, বিতর্কিত যে-বিষয়ে পরাজিত হওয়ার দরুন টাকা প্রদানের স্বীকৃতি রয়েছে সে বিষয়ের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থায় আপনি টাকা পেতে পারেন না। তবে অবশ্যই এ টাকা আপনার প্রবোধ ও মনের সান্ত্বনার জন্য কোন সরকারী ব্যাংকে জমা দেয়া যেতে পারে অথবা কোনো মহাজন বা বণিকের কাছে গচ্ছিত রাখা যেতে পারে। মোটকথা, (আপনার) যেভাবেই ইচ্ছা টাকার সম্পর্কে আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি। কিন্তু আপনার হাতে তুলে দিতে পারি না। আর এ বিষয়টি অতি সত্য ও ন্যায়সঙ্গত ও বটে যে, উভয় পক্ষের মাঝে (বিতর্কিত) যে বিষয়টি মীমাংসাযোগ্য এর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত টাকা কোন মধ্যস্থ ব্যক্তির হাতে থাকা উচিত। আশা করি, আপনি যেমন সত্যান্বেষী, তেমনি এ বিষয়টি ও বুঝে যাবেন এবং এর বরখেলাপে জেদ ধরবেন না।

আর এ শর্তেরই দ্বিতীয় অংশে আপনি লিখেছেন, বাসস্থান (গৃহ) ইত্যাদির বিষয়ে কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধার সম্মুখীন হলে তৎক্ষণাৎ আপনি গুজরাঁওলা ফিরে যাবেন এবং যে-টাকা জমা রাখা হবে তা আপনার হয়ে যাবে। আপনার এ শর্তটি ও এতো ব্যাপক ওজর ও জটিল ব্যাখ্যাসম্পন্ন যে এক ওজরে মানুষ অনেক কিছুরই অবকাশ পেতে পারে। কেননা ঘর কেন, প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে ছিদ্রান্বেষণ করা অতি সহজ। আপনি বলতে পারেন, এখানকার আবহাওয়া আপনার অনুকূল নয়, আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ঘরটিতে অনেক গরম, অমুক জিনিস আপনি সময়মত পান না, অমুকঅমুক আবশ্যকীয় জিনিসপত্র ঘরটিতে অনুপস্থিত ইত্যাদি, ইত্যাদি। এখন, এ প্রকারের ছিদ্রান্বেষণের কতটাই প্রতিকার করা যাবে? অতএব এ ব্যাপারটির এভাবে ব্যবস্থা হতে পারে যে, আপনি নিজে দু'/এক দিনের জন্য কাদিয়ানে এসে বাসস্থান ভালভাবে দেখে নেন এবং নিজের প্রয়োজনাদির বিষয়ে সামনা-সামনি আলোচনা ও মীমাংসা করে নেন, যাতে আমি আমার যতটুকু সাধ্যে কুলোয় আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে চেষ্টা করতে পারি। আর পরে যেন ছিদ্রান্বেষণের অবকাশ না থকে। তাছাড়া, এ অধম তো কখনও এমনটি দাবী করে না যে, কোন ব্যক্তিকে অথিতি হিসেবে নিজ বাড়ীতে রেখে তার নফ্সে-আম্মারার (কুপ্রবৃত্তিমূলক) সুখ ও আনন্দ এবং আরাম করার যে সব উপকরণ সে চাইতে থাকবে তা সবই তার জন্য আমি সরবরাহ করতে থাকবো। বরং এ বিনীত বান্দার অঙ্গীকার হচ্ছে, যে-ব্যক্তিই এ অধমের কাছে আসবেন তাঁকে নিজ গৃহের

ভাল জায়গা ও নিজ খাবার অনুযায়ী খাবার পরিবেশন করা হবে এবং যেভাবে একজন আত্মীয় ও প্রিয় অথিতির যথাসাধ্য আদর-আপ্যায়ন করা হয় সেভাবে তাঁর ও করা হবে। নিজ শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী, তাঁর সাথে আচার ব্যবহার বজায় রাখা হবে। খাওয়া-দাওয়ায় নিজের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি খেয়াল রাখা হবে। তাঁর যদি এ ধরনের কোন কষ্ট হয় যা এ গ্রামের অধিবাসী হয়ে আমরা সয়ে থাকি এবং যা দূর করা আমাদের সাধ্যাতীত হয় তাহলে সে কষ্টে আমাদের অথিতি আমাদের সাথে শরীক থাকবেন।

আর এ বিষয়টি আপনি বুঝুন বা না বুঝুন কিন্তু প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারেন আমরা যখন মাসহারা দু' শ' টাকা দেয়া স্বীকার করে নিয়েছি এবং তা পরিশোধ করার জন্য সর্বতঃ আশ্বাসের ব্যবস্থাও করে দিয়েছি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা এক্ষেত্রে আমাদের (আসল) কর্তব্য সম্পন্ন করেছি, অথবা কারও যে ক্ষতি পূরণের দায়-দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায় তা পালন করার অঙ্গীকার করেছি। এরপর বাসস্থান ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদির যে প্রস্তাবনা, তা নিছক বাড়তি ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়াদির শামিল, যা আমরা কেবল সদ্ব্যবহার ও উত্তম নৈতিকতাস্বরূপ নিজেরা নিজেদের দায়িত্বে বরণ করে নিয়েছি। নচেৎ প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মাত্র জানেন, যে-ব্যক্তিকে পুরোপুরি ক্ষতিপূরণ তার অবস্থা অনুযায়ী বরং তার চেয়েও বেশি দিয়ে দেওয়া হয়, তার পক্ষে এর পরও আরো কোন কিছু দাবী করা অসঙ্গত। সে যদি অধিক আরাম প্রিয় ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুরাগী হয়ে থাকে তাহলে তার পক্ষে সমীচীন হবে সে যেন নিজের আরাম-আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন, সে অন্য কোন জায়গা থেকে চাকরি বাবদ দু' শ' টাকা নগদ পেলে সে নিজের (থাকা-খাওয়ার) ব্যবস্থা নিজেই করতো। মোট কথা, ক্ষতিপূরণ বাদেও আমাদের পক্ষ থেকে কারও যদি খেদমত (আদর-আপ্যায়ন) করা হয়, সেজন্য তো তার পক্ষে আমাদের কৃতার্থ হওয়া উচিত। কেননা আমরা আসল শর্ত পূরণ করা ছাড়াও তাকে অতিথি হিসেবে রেখেছি। কাজেই তার পক্ষে উল্টো ছিদ্রান্বেষণ করা সমীচীন নয়। কেননা এটা ভদ্রতা, শালীনতা, নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিপন্থী।

আর এক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিতে এক তাজ্জবের বিষয় হলো, যে-সব শর্ত আপনি তুলে ধরেছেন সে রকম যদি কোন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্য কোন ব্যক্তি তুলে ধরতো তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। কিন্তু আপনারা তো নিজেরা হযরত মসীহ্ আলায়হিস সালামের খাদেম ও অনুগামী বলে আখ্যায়িত এবং তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার দাবীদার। অতএব এটা কত বড় ভুল যে, আপনারা হযরত মসীহ্র চরিত্র ও আদর্শকে পরিহার করেন। আপনারা কি জানেন না, হযরত মসীহ্ একজন অতি বিনয়ী ও মিসকীন-দরবেশ স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর সারা জীবন নিজের জন্য কোন ঘরবাড়ী বানাননি এবং বিলাসিতার কোন প্রকার আসবাবপত্র সংগ্রহ করেননি। তাহলে আপনি-ই বলুন, তাঁকে অনুসরণ করা আপনার জন্য আবশ্যক কি না? যতক্ষণ আপনাদের জীবনযাত্রা হযরত মসীহ্র জীবন যাত্রার নমুনায় (ও দৃষ্টান্তে) পরিণত না হয় ততক্ষণ আপনারা কী করে বলতে পারেন আপনারা হযরত মসীহের অনুসারী? অতএব এখন আপনারা ভেবে দেখুন, আমাকে আপনারা প্রথমেই যে নিজেদের ভোগ বিলাসের জন্য শর্তাবলী দিচ্ছেন তা কত অনুচিত ও অসঙ্গত! আপনাদের জ্ঞাতার্থে যেন প্রকাশ থাকে, এ অধম মসীহ্র জীবনের নমুনায় জীবন যাপন করে। কোন বাগান ঘেরা বড়লোকী ভবন/বাংলো আমার নেই। এ অধমের বাসস্থান সেই প্রকারের ভোগ-বিলাসের স্থান হতে পারে না, যে দিকে দুনিয়াপূজারী পার্থিব লোকদের প্রবৃত্তি ধাবিত ও অনুরক্ত। তবে আমার পদমর্যাদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী অতিথিদের জন্য একান্তভাবে আল্লাহ্র খাতিরে গৃহাদি নির্মাণ করা আছে। যতটুকু সাধ্যে কুলোয় এ অধম তাদের সেবা-যত্নের জন্য উদগ্রীব ও প্রস্তুত রয়েছে। অতএব আপনি যদি এরকম গৃহে (অতিথি হিসেবে) থাকা পুষিয়ে নিতে পারেন তাহলে আপনার পক্ষে প্রথমে এসে দেখে নেয়া উত্তম হবে। কিন্তু আপনি যদি বিলাসিতা প্রিয় লোকদের মত আমার কাছে আবদার করেন আপনার জন্য এমন এক শীশমহল দরকার যা বিলাসবহুল সামগ্রী দিয়ে সাজানো থাকে। যত্রতত্র ছবি টানানো হয়। মাতোয়ারা করে দেয় এমন পাণীয় দিয়ে বোতলগুলো ভরা থাকে। গৃহের চারদিক নয়নাভিরাম বাগান, এর চারপাশে নহর-নদী প্রবাহিত এবং দশ/বিশজন পরিচারক যেন কৃতদাসদের ন্যায় উপস্থিত থাকে। তাহলে এ ধরনের ব্যবস্থা পেশ করতে আমি অপারগ এবং সেক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রার্থী। বরং একটি আড়ম্বর বিহীন সাদাসিদে, কিন্তু সাধারণভাবে চলার মত বাসগৃহ মজুদ ও উপস্থিত রয়েছে।

আর পুনরায় বলছি, জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ ও এর আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি পরিহার করা আপনাদের কর্তব্য, যাতে আপনাদের মাঝে হযরত মসীহ্র জীবনের আলামতগুলো প্রকাশিত হয়। আমি কখনও মনে করি না উক্ত গৃহ আপনার জন্য কষ্টদায়ক হবে। বরং আমি পুরোপুরি আশ্বস্ত, একজন শোকরগুযার (কৃতজ্ঞতাপারায়ণ) ব্যক্তি এ গৃহে বাস করে কোন অভিযোগ অনুযোগের কথা কখনও বলবে না। কেননা (বাসোপযোগী) প্রশস্ত গৃহ মজুদ, এবং (এতে) চলার মত সবকিছু সহজলভ্য রয়েছে। আর এ-ও সম্ভবপর যে, গৃহ পরিদর্শনে আপনি যদি কয়েকটি সাধারণ ও সঙ্গত বিষয়ে ফরমায়েশ করেন তাহলে তা-ও আল্লাহ্র রহমতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু যাই হোক প্রথমে আপনার (কাদিয়ানে) আসা অত্যাবশ্যক।

এরপর আপনি দ্বিতীয় শর্তের ক্ষেত্রে লিখেন, 'ইলহাম ও মু'জিযার প্রমাণ এমন হওয়া চাই যেমন জ্যামিতি গ্রন্থে প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেসব প্রমাণের কারণে আমাদের অন্তর যেন মানতে বাধ্য হয়।' এ সম্পর্কে প্রথমত অধমের এ কথা স্মরণ রাখবেন, আমরা 'মু'জিযা' শব্দ কেবল সেক্ষেত্রেই বলে থাকি যখন কোন অলৌকিক ক্রিয়া কোন নবী ও রসূলের প্রতি আরোপিত হয়। কিন্তু এ অধম * নবীও নয়, রসূলও নয়, (বরং)

কেবল নিজ নির্দোষ নিষ্পাপ পবিত্র নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের একজন নগণ্য সেবক ও অনুগামী মাত্র।

আর এ মহিমান্বিত রসূলেরই বরকত ও আশীর্বাদে এবং তাঁরই অনুবর্তিতার কারণে এ সব নূর (ঐশী জ্যোতি), আশিস ও কল্যাণ প্রকাশিত হচ্ছে। অতএব এস্থলে 'কারামাত' শব্দটি সমীচীন। মু'জিযা শব্দটি নয়। এভাবেই আমাদের বোলচালে প্রচলিত। আর (নিদর্শন দেখানোর ক্ষেত্রে) আপনারা যে জ্যামিতির মত প্রমাণ (দেখতে) চান এ সম্পর্কে নিবেদন যে, আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহক্রমে যে উজ্জ্বল নিদর্শন আপনাদের দেখানো হবে এর তুলনায় জ্যামিতির প্রমাণাদি অতি তুচ্ছ। কেননা এগুলো কাল্পনিক চক্রভিত্তিক (হয়ে থাকে)। জ্যামিতির প্রমাণের অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনার অবকাশ রয়েছে। এ প্রমাণগুলোর দৃষ্টান্ত এমনই যেমন কেউ বললো, 'প্রথমে আপনি যদি প্রমাণ ছাড়াই কোন এক পশু সম্পর্কে স্বীকার করে নেন যে, সেটি ফসল খেয়ে থাকে, মেঁ মেঁ শব্দ করে এবং এর গায়ে পশম আছে, তাহলে আমরা প্রমাণ করে দিলাম, সেটি হচ্ছে মেষ শাবক। তেমনি জ্যামতির ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত প্রদানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ববিরোধ রয়েছে। যেমন, প্রথমে এটি নিজেই লেখে, বিন্দু সেই বস্তু যার কোন ভাগ নেই অর্থাৎ যা বিভাজ্য নয়। আবার এটি অন্যত্র নিজেই সাব্যস্ত করে (সিদ্ধান্ত দেয়), প্রত্যেক রেখার সমান সমান পরিমাণের দু'টো টুকরো হতে পারে। এখন ধরুন, একটি সরলরেখা ৯টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। আর জ্যামিতির উক্ত দাবী অনুযায়ী সে রেখাটিকে দু'টো সমান ভাগে ভাগ করতে চাই। এ ক্ষেত্রে হয়তো পূর্বোল্লিখিত সিদ্ধান্তের বরখেলাফ একটি বিন্দুর দু' টুকরো হয়ে যাবে। নয়তো প্রত্যেক সরলরেখা দু'টো সমভাগে বিভক্ত হতে পারে–জ্যামিতির এ দাবী ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। মোট কথা, জ্যামিতি শাস্ত্র বহু কাল্পনিক ও প্রমাণবিহীন বিষয়ে ভরপুর, যা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভালভাবে জানেন। কিন্তু ঐশী নিদর্শন তো সেই বিষয় যা স্বয়ং অস্বীকারকারীর সত্তায় কার্যকরী হয়ে তাকে 'হাক্কুল্ একীন' তথা অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানে উপনীত করতে পারে। মানুষের পক্ষে তা মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। অতএব নিশ্চিন্ত থাকুন, এসব অতি মহান ঐশী নিদর্শনের সাথে জ্যামিতির তুচ্ছ ধ্যান-ধারণার তুলনা করার কোন অবকাশ নেই। 'চে নিসবাৎ খাক রা বা আলমে পাক' (–পবিত্র উর্ধ জগতের সাথে ধূলো বালির ধরার তুলনাই বা কী–অনুবাদক)। কেবল এ অধমের বর্ণনায় নয় বরং সালিসদের মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। যতক্ষণ উভয় পক্ষের ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন এমন সালিসগণ এসব অলৌকিক কান্ড ও ভবিষ্যদ্বাণী মানবীয় ক্ষমতার উর্ধে বলে সাক্ষ্য না দেন ততক্ষণ আপনারা বিজয়ী এবং এ অধম পরাভূত বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এসব অলৌকিক ঘটনা ও ভবিষ্যদ্বাণী মানবীয় ক্ষমতার উর্ধে হবার সমর্থনে সাক্ষ্য পাওয়া গেলে আপনারা পরাজিত এবং আমি আল্লাহ্র অনুগ্রহে বিজয়ী সাব্যস্ত হবো এবং তৎক্ষণাৎ এখানেই অর্থাৎ কাদিয়ানে আপনাদের ইসলামে দীক্ষিত (হয়ে মুসলমান) হতে হবে।

* টীকা এটা তাঁর (আঃ) সত্যতার প্রমাণ। যতক্ষণ আল্লাহ্তাআলা তাঁর কাছে নবুওয়তের বিষয় স্পষ্টভাবে খোলাসা করে দেননি তিনিও এর দাবী করেননি। (সম্পাদক)

আপনি আবার চিঠির উপসংহারে লিখেছেন, "উল্লেখিত শর্তগুলো আপনি গ্রহণ না করলে আপনার অবস্থা এবং এসব শর্ত ভারতবর্ষের কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।" অতএব হে আমার মেহেরবান! যা যা সত্য ছিল তা সবই আপনার খিদমতে লিখে দেয়া হয়েছে এবং এ অধম আপনার অবস্থাবলী প্রকাশ করানো বা করায় ভয় পায় না। বরং কে জানে, আপনার পক্ষ থেকে কবে ও কখন পত্রিকায় এ বিষয় প্রকাশ করবেন। কিন্তু এ অধম তো আজই এ চিঠির অনুলিপি কয়েকটি পত্রিকায় ছাপার জন্য পাঠাচ্ছে। আর আপনাকে প্রথমেই এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিচ্ছে যাতে আপনার কষ্ট করার প্রয়োজন না থাকে। এরপর যা কিছু আপনার পক্ষ থেকে প্রকাশ পাবে তা-ও বিশ দিন অপেক্ষা করার পর কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশ করে দেয়া হবে। আর আপনি যদি একটু আত্মাভিমানবোধ কাজে লাগিয়ে কাদিয়ানে চলে আসেন তাহলে দেখতে পাবেন, দয়াময় মহান খোদা কার সাথে আছেন এবং তিনি কার সাহায্য ও সমর্থন করেন। আর তখন আপনার কাছে এটাও স্পষ্ট হয়ে পড়বে, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ও অধিপতি সত্য ও প্রকৃত খোদা কি বস্তুতপক্ষে মরিয়মপুত্র (মসীহ), নাকি অনাদি অনন্ত, অপরিবর্তনীয় ও পরম পবিত্র সেই খোদা, যাঁর প্রতি আমরা ঈমান রাখি। অতএব আমি আপনাকে সেই পরিপূর্ণ ও সর্বতঃসত্য খোদার কসম দিচ্ছি, আপনি আসুন, অবশ্য-অবশ্যই আসুন। যদি উক্ত কসম আপনার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারে কার্যকরী না হয়ে থাকে তাহলে যুক্তি ও অভিযোগের পূর্ণতার উদ্দেশ্যে আপনাকে হযরত মসীহ্র কসম, আপনি আসতে একটুও বিলম্ব করবেন না, যাতে সত্য ও মিথ্যার মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে তা প্রকটিত হয় এবং সত্যবাদী ও মিথ্যেবাদীদের মধ্যকার স্বতন্ত্র নির্ণয়কারী বিষয় আপনাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হয়। **'ওয়াস্সালামু আলা মানিত্তাবায়াল হুদা'** (–সত্যপথ অনুসরণকারীর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক–অনুবাদক)।

বা-ওক্তে সুবোহ্ শুদ হাম চো রোয মা'লুমত
কেহ্ বা কেহ্ বাখ্তা-ই-ইশ্ক দার্ শাবে দিজূর॥
মান ইস্তাদা আম ইঁকে তু হাম বায়া শাতাব
কেহ্ তা সিয়াহ্ শুদ রূয়ে কাযিবে মাগরূর॥

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী
বিনীত–মির্যা গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, জেলা-গুরুদাসপুর।

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর
অষ্ট্রেলিয়া সফরের বিবরণ

(৪র্থ খন্ড)

সিংগাপুর থেকে বিদায়ের ক্ষণ কাছে আসছে। হুযূর আনোয়ারের মসজিদ থেকে হোটেলে যাওয়ার প্রোগ্রাম। মসজিদের বাইরে খোলা প্রাঙ্গনে অনেক পুরুষ ও মহিলা সমবেত হয়েছেন। ছোট বড় সব পুরুষ মহিলারা কাঁদছে। শিশুরা প্রার্থনামূলক নযম পড়ছে। সকলের চোখ ছল ছল করছে। হুযূর আনোয়ার মসজিদ থেকে বাইরে এলেন। সকলে হাত উঁচু করে, কাঁদতে কাঁদতে এবং দীর্ঘশ্বাস নিতে নিতে তাদের প্রিয় ইমামকে নিজেদের আকীদা, ভালবাসা আর আত্মোৎসর্গের প্রকাশ করছে। সকলের দৃষ্টি তাদের প্রিয় ইমামের দিকে নিবদ্ধ। সকলে হুযূরকে দেখছে আর কাঁদছে। হুযূর আনোয়ার বিদায়কালীন দোয়ার জন্য হাত উঠালে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতরণা হয়। দীর্ঘশ্বাস কান্নায় বদলে যায়। হুযূর আনোয়ারের বিদায় তাদের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। দোয়ার পরে হুযূর (আইঃ) তাঁর হাত উঁচু করে সকলকে আস্সালামু আলাইকুম বলেন আর হুযূরের গাড়ী মসজিদের গেট থেকে বার হয়ে হোটেলের দিকে রওনা হয়। হুযূর আনোয়ারের এ সব প্রেমিকরা নিজেদের হাত নেড়ে তাদের প্রিয় ইমামের বিদায় জানায়।

২-৫০ মিনিটে হুযূর আনোয়ার হোটেলে পৌঁছান। এখানে দায়িত্বে নিয়োজিত খোদ্দামরা হুযূরের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য পায়। কর্মসূচী অনুসারে ৬টায় হুযূর আনোয়ার গ্রান্ড মারকারী রক্সী হোটেল থেকে সিংগপুরের ইন্টারন্যাশনাল বিমান বন্দর চেঙ্গীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সাড়ে ছটায় হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বিমান বন্দরে পৌঁছান। হুযূরের বিমান বন্দরে আসার আগে জিনিষ পত্রের বুকিং ও বোডিং কার্ড নেয়ার কাজ শেষ হয়।

বিমান বন্দরে হুযূর আকদাসকে বিদায় জানানোর জন্য জামাতের অনেক পুরুষ ও মহিলা সদস্যরা সমবেত হয়। সিংগাপুর ছাড়া আশপাশের দেশ মালয়েশীয়া, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ব্রুনাই, পাপিয়া নিউগিনি ও শ্রীলংকা থেকে আগত জামাতের কর্মকর্তাবৃন্দ ও মুরব্বীয়ান হুযূর আনোয়ারকে বিদায় জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন।

হুযূর আনোয়ার হাত উঁচু করে সকলকে আস্সালামু আলাইকুম বলেন এবং দোয়া করান। দোয়ার পর হুযুর ইমিগ্রেশন ডেক্স হয়ে লাউঞ্জে চলে যান। এ সময় বিমান বন্দরে আগত পুরুষ ও মহিলারা অনবরত হাত নাড়তে থাকেন। হুযূর আনোয়ার ও বার বার নিজের হাত উঁচু করে তাদের সালামের উত্তর দেন। মাঝখানে কেবলমাত্র কাঁচের দেয়াল ছিল। যেখানে দুদিক থেকে সব দেখা যাচ্ছিল। শেষে হুযূর কিছুক্ষণের জন্য লাউঞ্জে চলে যান। ৭-৪০ মিনিটে হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বিমানে ওঠেন। ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের BA015 নং ফ্লাইট সময় মত রাত ৮ টায় সিংগাপুর থেকে অষ্ট্রেলিয়ার সিডনি বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

১১ এপ্রিল ২০০৬, অষ্ট্রেলিয়াতে বরকতপূর্ণ অবতরণ

সোয়া সাত ঘন্টা অবিরত ওড়ার পর অষ্ট্রেলিয়ার স্থানীয় সময় অনুসারে ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার সকাল সোয়া পাঁচটায় বিমান সিডনির (অষ্ট্রেলিয়া) আন্তর্জাতিক কিংস ফোর্ড স্মীর্থ বিমান বন্দরে অবতরণ করে। আর ঐ ঐতিহাসিক ক্ষণ উপস্থিত হয় যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর পা প্রথম বার অষ্ট্রেলিয়ার এ ভূমিতে এবং পৃথিবীর এ মহাদেশে পড়ে।

হুযূর আনোয়ার বিমান থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে অষ্ট্রেলিয়া জামাতের আমীর মাহমুদ আহমদ সাহেদ হুযূর আনোয়ারকে স্বাগত জানান। এ সময়ে বিমান বন্দরের ডেপুটি ম্যানেজার এবং কাষ্টমের একজন কর্মকর্তাও হুযূর আনোয়ারকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং নিজেদের সাথে তাঁকে ভি আই পি লাউঞ্জে নিয়ে আসেন। এখানে অষ্ট্রেলিয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কিছু কর্মকর্তা তাদের প্রিয় খলীফাকে সু-স্বাগত জানান। আর হুযূর আকদসের সাথে মোসাফাহা করার মর্যাদা পান। লাজনা ইমাইল্লাহ্ অষ্ট্রেলিয়ার সদর এবং অষ্ট্রেলিয়া জামাতের আমীর সাহেবের স্ত্রী হযরত বেগম সাহেবা মদ্দাজাল্লাহুকে স্বাগত জানান। হুযূর আনোয়ার স্নেহের সাথে এখানে উপস্থিত জামাতের বন্ধুগণ এবং আমীর ও মুরব্বী ইনচার্জ অষ্ট্রেলিয়া মোকার্‌রম মাহমুদ আহমদ সাহেদ সাহেবের সাথে আলোচনা করেন। তিনি এখানের অবস্থা, জামাতের অবস্থা এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন। এ সময়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিজেরাই ইমিগ্রেশনের কাজকর্ম সম্পাদন করে। বিমান বন্দরের সকল ব্যবস্থাপনা প্রশাসনের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে করা হয়।

৬টা-১০মিঃ হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বিমান বন্দর থেকে জামাতের কেন্দ্র আল হাদীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। জামাতের এই কেন্দ্র সিডনি শহরের বাইরে ব্লাক টাউন সিটি কাউন্সিলের এলাকায় মার্সডেন পার্কে

অবস্থিত। সিডনি বিমান বন্দর থেকে এ স্থানের দুরত্ব ৬০ কিলো মিটার। ৭টা ৮মিঃ হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বায়তুল হাদীতে পৌছান। এখানে সারা দেশের জামাত থেকে আগত পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা নারায়ে তাকবীরের উচ্চ আওয়াজের সাথে নিজেদের প্রিয় খলীফাকে স্বাগত জানান। বাচ্চারা অভ্যর্থনা সংগীত গেয়ে হুযুর আনোয়ারকে সু-স্বাগতম জ্ঞাপন করে। আর হুযূর আনোয়ার ও হযরত বেগম সাহেবাকে পুষ্প স্তবক অর্পন করে।

আতফাল এবং নাসেরাত নিজেদের হাতে আহমদীয়াতের পতাকা এবং দেশের পতাকা নিয়ে ওড়াতে ওড়াতে হুযূর আনোয়ারকে খোশআমদেদ বলতে থাকে। হুযূর আনোয়ার সকলের কাছ থেকে যাওয়ার সময় নিজের হাত উঁচু করে আস্সালামু আলাইকুম বলতে বলতে মিশন হাউসের আবাসিক এলাকায় চলে যান। অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অবস্থানকালীন সময়ে হুযূর আনোয়ার (আইঃ) মিশন হাউজের আবাসিক এলাকায় থাকেন।

বায়তুল হাদী অষ্ট্রেলিয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাত অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরের বাইরে মার্সডেন পার্ক এলাকায় ২৮ একর জমি কেনার সৌভাগ্য হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) ১৯৮৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে অষ্ট্রেলিয়াতে তাঁর প্রথম সফরের সময় এ মহাদেশে প্রথম আহমদী মসজিদ বায়তুল হাদীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব ও এ মসজিদের ভিত্তি প্রস্তরে একটি ইট স্থাপন করেন। তিনি হুযূরের বিশেষ নির্দেশে এ মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য পাকিস্তান থেকে অষ্ট্রেলিয়া আসেন। অষ্ট্রেলিয়ার ভূ-খন্ডের এ কেরামত আছে যে এখানে ১৯০৩ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এক সাহাবী হোসেন মুসা খান সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের আরম্ভ হয়। আর এ মহাদেশের প্রথম আহমদী মসজিদের ভিত্তিতে এক সাহাবীর ইট রাখার সৌভাগ্য হয়। এ মসজিদের নির্মাণ ১৯৮৯ সালের মে মাসে সম্পন্ন হয়। হুযূর খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) অষ্ট্রেলিয়ায় তাঁর দ্বিতীয় সফরে ১৯৮৯ সালের ১৪ জুলাই এ মসজিদের উদ্বোধন করেন।

এ মসজিদের একদিকে হাইওয়ে রিচমন্ড রোড আর অন্য দিকে হাস ওয়ার্থ রোড চলে গেছে। এ মসজিদের দু-তলা সুন্দর ইমারত, তার সাদা রং, গম্বুজ ও মিনারের কারণে দূর থেকে নজরে আসে। আর বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা লোকদের মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। এ মসজিদে নামাযীদের জন্য দুটো বড় হল, দুটো বড় কামরা, অফিস, লাইব্রেরী, মিশন হাউজ এবং গেষ্ট হাউজ আছে। মসজিদের একটি মিনার যা মিনারাতুল মসীর আদলে তৈরী করা হয়েছে তা ১০০ ফুট উঁচু। আর সাথে একটি উঁচু গম্বুজ আছে।

অষ্ট্রেলিয়ার এ মসজিদ এজন্যেও বিশেষ গুরুত্ব রাখে যে, এর নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে আহমদী বন্ধুরা ও মহিলারা ওয়াকারে আমলের সাহায্যে খুবই খেদমত করে। ওয়াকারে আমলের সাহায্যে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন হলেও এ মসজিদের উঁচু ও লম্বা-চওড়া ইমারতের রং ও বার্নিসের কাজ বাকী ছিল। যার জন্য ৫০ হাজার ডলার ব্যয় নিশ্চিত ছিল। অষ্ট্রেলিয়ার আহমদীরা এ কাজ নিজেরা করেছে। ভিন্ন ভিন্ন কামরা বিভিন্ন পরিবারকে দেয়া হয়েছে। তারা নিজেদের অবসর সময়ে মনোযোগ দিয়ে এ কাজ করে। এক অংশ লাজনাদের দায়িত্বে ছিল। তারাও এ কাজ খুব সন্তুষ্টির সাথে ও ভালভাবে সম্পাদন করে।

এ মসজিদের গম্বুজের ঘের ২৪ ফুট, যার অলংকৃত অংশের উচ্চতা ৭ ফুট। এর নির্মাণ জমিনের ওপর হয়েছে। ষ্টীল ফ্রেম আহমদী বন্ধুরা নিজেরা তৈরী করেছে। আর এর ওপর ফাইবার গ্লাস লাগনোর কাজ আহমদী মহিলারা করেছে। যা প্রকৃতপক্ষে অভূতপূর্ব।

এ গম্বুজ তৈরী হওয়ার পর এত বড় ও ভারী হয় যে, তা একটি ক্রেনের সাহায্যে উঠিয়ে ছাদের উপর রাখা হয়। প্রধান সড়ক থেকে জামাতের জমি ও মসজিদ পর্যন্ত দূরত্ব হল ১.৩ কিলোমিটার। জামাত এই ১.৩ কিলোমিটার লম্বা রাস্তা নির্মাণ করেছে। যা মসজিদ পর্যন্ত এসেছে। এ সড়ক এবং এর আশ পাশের জমি জামাতের নিজস্ব সম্পত্তি।প্রধান সড়কের যেখান থেকে সড়ক শুরু হয়েছে সেখানে মেন গেট আছে। সেখানে আহমদীয়া মিশনের বোর্ড টাঙ্গানো আছে। সাড়ে ৪টার সময় হুযূর আনোয়ার (আইঃ) পুরুষদের জলসাগাহের জন্য নির্মিত মার্কিতে আসেন। এখানে তিনি যোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) মসজিদের বাহিরের অংশ পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন অংশ দেখেন আর মসজিদের ডাইনে বায়ে অফিস ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এ ছাড়া হুযূর জিজ্ঞাসা করেন। এখন এখানে অতিরিক্ত নির্মাণের কি পরিকল্পনা আছে। এর প্রেক্ষিতে আষ্ট্রেলিয়ার আমীর সাহেব বলেন এখানে একটি বড় হল তৈরী করার প্রোগ্রাম আছে। এছাড়া গেষ্ট হাউস এবং অংগসংগঠন সমূহের অফিস ইত্যাদিও বানাতে হবে। মসজিদের জন্য সংরক্ষিত এ জমির ক্ষেত্রফল ২৮ একর।

হুযূর আনোয়ার বিভিন্ন দিক থেকে এ ভূ-খন্ডের সীমানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

মসজিদের আশে পাশে বিভিন্ন অংশে সালানা জলসার ব্যবস্থাপনার জন্য

সামিয়ানা ও তাঁবু লাগানো হয়। হুযূর আনোয়ার এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এ পরিদর্শনের পরে হুযুর আনোয়ার নিজের আবাসস্থলে চলে যান।

ফেডারেল পার্লামেন্টের সদস্যের সাথে সাক্ষাতকার

কর্মসূচী অনুসারে সাড়ে পাঁচটায় চিফলে এলাকার ফেডারেল পার্লামেন্টের সদস্য রোজার প্রাইস হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য হুযূর আকদাসের অবস্থান স্থলে আসেন। এ সাক্ষাতকার প্রায় এক ঘন্টা অব্যাহত থাকে। বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী বিষয়ের ওপর মত বিনিময় হয়। একজন ধর্মীয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে হুযূরের উচ্চ জ্ঞান দেখে পার্লামেন্ট সদস্য অবাক হয়ে যান। কৃষিকার্যের বিষয়ে হুযূরের গভীর জ্ঞান আছে জেনে তিনি খুবই উৎসাহী হয়ে পড়েন। বিশেষ করে আফ্রিকার ঘানায় হুযূর (আইঃ) এর গম উৎপাদনের প্রচেষ্টার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আলোচনার মাঝে হুযূরের কাছ থেকে তিনি শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে জামাতের অবদানের কথা জিজ্ঞাসা করেন। হুযূর আকদাস তাকে এ দুটো ক্ষেত্রে জামাতের সেবার কথা বলেন। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সুন্দর পরিবেশে এ আলোচনা হয়। পার্লামেন্ট মেম্বার রোজার প্রাইস বলেন যে তাকে কোন কাজের জন্য দেশের বাইরে যেতে হচ্ছে। তা না হলে তিনি হুযূর আনোয়ারের সাথে আরো বেশি সময় থাকতেন। আর হুযূর আনোয়ারকে দেশের রাজধানী ক্যানবেরা ও পার্লামেন্ট হাউজ দেখাতেন। তিনি বলেন আগামী বার যখন হুযূর আনোয়ার অষ্ট্রেলিয়াতে আসবেন তখন তিনি তাঁর সাথে অনেক সময় কাটাবেন। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে জামাতের সেবার প্রশংসা করেন।

সাক্ষাতকার

পার্লামেন্টের এ সদস্যের সাথে সাক্ষাতের পর প্রায় সাড়ে ছটায় হুযূর আনোয়ার নিজের অফিসে যান। সেখানে পারিবারিক সাক্ষাতকার শুরু হয়। এ দিন অষ্ট্রেলিয়া জামাতের সিডনি ও মেলবোর্ণের ৪৫টি পরিবারের ১৭০ জন সদস্য হুযূর আকদাসের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করে। হুযূর আনোয়ারের সাথে ছবিও তোলে। সক্ষাতকারের এ কর্মসূচী রাত আটটা পর্যন্ত চলে। সাক্ষাতকারের পর হুযূর আনোয়ার পুরুষদের মার্কিতে আসেন এবং মাগরেব ও এশার নামায জমা করে পড়ান। নামায আদায়ের পর হুযূর (আইঃ) তাঁর অবস্থান স্থলে চলে যান।

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ

অষ্ট্রেলিয়া দুনিয়ার একমাত্র দেশ যা পুরো মহাদেশে ব্যাপ্ত। এটি হল দুনিয়ার সব থেকে বড় দ্বীপ এবং ছোট মহাদেশ। এ দেশের একের তিন অংশ মরুভূমি। জনসংখ্যার ৮০ ভাগ সমুদ্রের কুলে বাসবাস করে। অষ্ট্রেলিয়া প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটার চওড়া আর উত্তর দক্ষিণে ৩৭০০ কিলোমিটার লম্বা। এদেশের মোট আয়তন ৭৬ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৬১বর্গ কিলোমিটার। আর জন সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষ। এখানের আসল বসবাসকারীদের আদিবাসী বলা হয়। যারা গত ৬০ হাজার বছর থেকে এখানে বসবাস করছে। এরা ৬০০ বেশী গোত্রে বিভিক্ত। এদের সংখ্যা বর্তমানে ৩ লাখের কাছাকাছি।

আহমদীয়তের ইতিহাস

১৯০৩ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর এক সাহাবী হোসেন মুসা খান সাহেবের মাধ্যমে অষ্ট্রেলিয়াতে আহমদীয়াত শুরু হয়। তিনি আফগান উপজাতি তারইন এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর ১৯০১ সালে অষ্ট্রেলিয়াতে এসে বসতি স্থাপন করেন। ১৯০৩ সালে তিনি হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর হাতে বয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন শহরে গিয়ে তবলীগের কাজ করতেন। ১৯২১ সালে তিনি দি সান সাইন (The Sun Shine) নামে একটা প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক পত্রিকা বের করেন। তিনি ১৮ আগষ্ট ১৯৪৫ সালে অষ্ট্রেলিয়াতে মৃত্যুবরণ করেন। অষ্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরের কাররা কাট্টা (Karra Katta) নামীয় কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

এখন আল্লাহ্তাআলার ফযলে অষ্ট্রেলিয়ার সাতটি শহরে খুবই গতিশীল ও শক্তিশালী জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে। আর জামাতের ২৮ একর জমিতে বিস্তৃত ও লম্বা-চওড়া মসজিদ ও মিশন হাউস প্রতিষ্ঠা করার সৌভাগ্য হয়েছে। অন্য শহর মেলর্বোন, ব্রিজবেন এবং এডিলেটেও জামাতের মিশন হউস আছে। আরও অনেক স্থানে জামাতের পক্ষ থেকে জমি খরিদ করা হয়েছে।

আল্লাহ্তাআলার ফযলে অষ্ট্রেলিয়াতে জামাতের একটি সুন্দর অবস্থান আছে। এখানের প্রশাসন জামাতকে ভাল চোখে দেখে।

১২ এপ্রিল ২০০৬

সকাল সোয়া পাঁচটায় হুযূর আনোয়ার (আইঃ) পুরুষদের জলসাগাতে উপস্থিত হয়ে ফযরের নামায পড়ান এবং নামায শেষে হুযূর তাঁর অবাস স্থলে ফিরে যান। সকালে হুযূর ডাক দেখেন। সাড়ে দশটায় হুযূর আনোয়ার নিজের অফিসে আসেন। এখানে কর্মসূচী অনুসারে পারিবারিক ও এককভাবে বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতকারের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ দিন আহমদীয়া মুসলিম জামাত সিডনী (অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া) পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং মরিশাস থেকে আগত বন্ধুরাও হুযূর আনোয়ারের সাথে সাক্ষাতকারের সম্মান পায়। সমবেত ভাবে ৫০টি পরিবারের ১৪৭ ব্যক্তি হুযূর

আনোয়ারের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করে।

সাক্ষাতকারের এ কর্মসূচী দুপুর ১টা পর্যন্ত জারী থাকে। দেড়টার সময় হুযূর আনোয়ার (আইঃ) পুরুষদের জলসাগায়ে আসেন এবং যোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর হুযূর (আইঃ) তাঁর আবাস স্থলে চলে যান। তিন প্রহর পর হুযূর আনোয়ার ডাক দেখেন এবং ৫টার সময় নিজের দপ্তরে আসেন। এখানে প্রোগাম অনুসারে (Solomon Island) সলোমন আইল্যান্ড থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হুযূর আনোয়ারের সাক্ষাতের সম্মান অর্জন করে।

সলোমন আইল্যান্ডের প্রতিনিধিদের হেদায়াত

সলোমন আইল্যান্ডের (Solomon Island) একটি প্রতিনিধি দল অষ্ট্রেলিয়ার সালানা জলসায় যোগদানের জন্য পৌছায়। ৯০০ দ্বীপ নিয়ে গঠিত এ দেশ দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে (South Pecific Ocean) পাপুয়া নিউগিনির পূর্বদিকে অবস্থিত। এ দেশের লোক সংখ্যা ৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৪৩৮ জন। এখানে পলিনেসিয়ান, মেলানেশীয়ান এবং মাইকোলেশিয়ান (Polynesion and Mironesian) জাতির আবাস। দেশের রাজধানী হানিয়ারা (Haniara)। এ দেশ ১৯৭৮ সালের ৭ জুলাই বৃটিশ যুক্ত রাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা পায়। ১৯৯৪ সালে এ দেশে হাফেয আহমদ জিব্রাইল সৈয়দ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ের মধ্যে কিছু লোক আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আর জামাত প্রতিষ্ঠা হয়। ২০০১ সালে এ দেশকে অষ্ট্রেলিয়া মিশনের অধীনে দেয়া হয়। অষ্ট্রেলীয়ার আমীর সাহেব এখানে মুসা বিন মসরান সাহেবকে ওয়াক্‌ফে আরজি হিসেবে পাঠান। তিনি অনেক দিন এখানে অবস্থান করেন। এখানের জামাতকে সংগঠিত করেন এবং তবলীগের প্রোগ্রাম খুবই সফল হয়। তখন আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এখানের বিভিন্ন দ্বীপে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হুযূর (আইঃ) জামাতের সদর মোবাশ্বের মার্টিন রাসু সাহেবকে এ জামাতের লোক সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হুযূর (আইঃ) আরো জানতে চান তিনি কিভাবে আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। জামাতের সদর সাহেব বলেন, হাফেয মোহাম্মদ জিব্রাইল সাহেবের মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে আহমদীয়ত গ্রহণ করি। এ দেশে কোন বিশ্বাসী ছিল না। আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে এ দেশে প্রথম ইসলাম প্রবেশ করে।

হুযূর আনোয়ার মজলিসে আমেলা গঠন করা সম্পর্কে জিঙ্গাসা করেন। উত্তরে বলা হয়, ছয় জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে মজলিসে আমেলা প্রতিষ্ঠিত আছে। সদর খোদ্দমুল আহমদীয়া সলোমান আইল্যান্ডের এ প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। হুযূর আনোয়ার তাঁর কাছে খোদ্দামের সংখ্যা, তাদের সাথে যোগাযোগ উপায় এবং এ সব দ্বীপে যাতায়াতের মাধ্যম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, হুযূর আনোয়ারকে বলা হয় যে নৌকা এ দ্বীপ সমূহে যাতায়াতের বড় মাধ্যম। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপ যাওয়া ছাড়াও দ্বীপের অভ্যন্তরে সফরের বড় মাধ্যম নৌকা। কোন কোন স্থানে ট্রাক ব্যবহার করা হয়।

সদর খোদ্দমুল আহমদীয়া সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ভবিষ্যতে নিজের দ্বীপের প্যারামউন্ট চীপ হবেন। হুযূর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন তার দ্বীপ কত বড়। সদর সাহেব বলেন, ৯৯টি দ্বীপে তার গোষ্ঠীর লোকজন বসবাস করে। হুযূর আনোয়ার চীফ এর নির্বাচনের বিষয়ও জানতে চান। হুযূর আনোয়ার সদর খোদ্দামুল আহমদীয়াকে নির্দেশ দেন যে, তালিকা তৈরী করুন এবং তাদের তাজনীদ সম্পন্ন করুন। প্রত্যেকের সাথে আপনার সম্পর্ক হওয়া উচিত। হুযুর আনোয়ার বলেন, খোদ্দামরা বিভিন্ন ছোট ছোট দ্বীপে বসবাস করে সেজন্য এ সব দ্বীপে এরূপ কায়েদ মনোনীত করুন যেন তারা আপনার সাথে কাজ করতে পারে। আর খোদ্দামুল আহমদীয়াকে একত্রিত করুন, যাতে জানা যায় যে সমন্বিত সংখ্যা কত। হুযূর আনোয়ার বলেন, নিজেদের মুরব্বীকে সাথে নিয়ে খোদ্দামদের সংগঠিত করুন।

হুযূর আনোয়ার MTA সম্পর্কেও খোজখবর নেন। সদর সাহেব বলেন, আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে MTA দেখা যায়। হুযূর আনোয়ার মূসা বিন মুসরান সাহেবকে বলেন, আপনি ওখানে MTA এর টিমের সাথে যান আর MTA এর জন্য ডকুমেন্টারী তৈরী করে পাঠান।

হুযূর আনোয়ার সদর সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, অন্যান্য দ্বীপ যেখানে আহমদী আছে তাদের দূরত্ব কত। আর আহমদী বন্ধুদের সাথে কখন যোগযোগ হয়। এর উত্তর জামাতের সদর সাহবে জানান, কিছু দ্বীপ থেকে নিয়মিত জাহাজ আসে। কিন্তু কিছু স্থানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ নেই।

হুযুর আনোয়ার সলোমান আইল্যান্ডের সদর সাহেবকে হেদায়াত দেন যে, আপনি অষ্ট্রেলিয়া জামাতের অধীন বিভিন্ন দ্বীপ সফরের কর্মসূচী তৈরী করুন। খরচের পরিমাণ জরিপ করে জানান। এ সফরের সময় তবলীগের সাথে সাথে দ্বীপের আহমদীদের তরবীয়ত ও তাদের সু-শৃঙ্খল করার কাজও করুন। হুযূর আনোয়ার বলেন; প্রথমে আপনার সমস্ত কর্মসূচী আমীর অষ্ট্রেলিয়ার নিকট থেকে মঞ্জুরী করে নিন।

এ দেশে ঘানা থেকে আগত একজন মোয়াল্লেম নিযুক্ত আছেন। হুযুর আনোয়ার তাকে হেদায়ত দেন, আপনি দৈনিক ডাইরির মাসিক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন অষ্ট্রেলিয়ার আমীর সাহেবকে প্রেরণ করবেন। আর আপনার কার্যক্রমের মাসিক রিপোর্ট আমার কাছে পাঠান। হুযূর আনোয়ার সেক্রেটারী মালকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার কাছে কি চাঁদা দাতা এবং হিসেব নিকাশের সব রিপোর্ট মজুদ আছে। আপনার কাছে আয় ও ব্যয়ের সকল রেকর্ড থাকতে হবে। ব্যাংকের হিসাবেরও রেকর্ড থাকতে হবে।

হুযূর আনোয়ার সদর জামাতকে বলেন, যে খরচ হবে। আপনার নজরে থাকতে হবে। যা খরচ হবে সঠিকভাবে এবং সঠিক স্থানে খরচ হবে। হুযূর আনোয়ার তাদের বাজেট তৈরী করার পদ্ধতি, হিসেব নিকাশ ও আয় ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বোঝান। আর বলেন আপনারা ফেরত গিয়ে এভাবে নিজেদের সব কাজ সংগঠিত করুন। তিনি বলেন, আপনারা প্রত্যেকে জামাতের শিক্ষক, আপনাদের মিশন হাউস ও আছে, জামাত রেজিষ্ট্রার্ড, মুরব্বী সিলসিলা আছেন। মজলিসে আমেলা প্রতিষ্ঠিত আছে। এজন্য নিয়মিত সু-শৃঙ্খলভাবে নিয়ম মাফিক ও পদ্ধতিগতভাবে নিজেদের খরচপাতি ও কাজ সংগঠিত করুন। যে খরচ হবে তা সম্পূর্ণ ভাবে আমেলা মঞ্জুরী দেবে। হুযূর আনোয়ার এ সম্পর্কে কিছু প্রশাসনিক হেদায়াত দান করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সলোমান আইল্যান্ডের প্রাথমিক সময়ের যে সব আহমদী আছেন, তারা ভাল মুরব্বী হতে পারেন। তারা নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানেন। হুযূর আনোয়ার বলেন, এখন আপনারা আরো তবলীগ করুন এবং লোকদের জামাতের অন্তর্ভূক্ত করুন। আপনারা এখন জামাতের শিক্ষক, এজন্য নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করুন।

হুযূর আনোয়ার মুসি বিন মুসরান সাহেব, যিনি দ্বীপপুঞ্জে ওয়াকফে আরজীতে যান, হেদায়াত দেন যে, আপনি ওখানে যেতে থাকবেন। এখন জামাত রেজিষ্টার্ড হয়েছে। সেজন্য নিজেদের জন্য সম্পত্তি কেনা যায়।

হুযূর আকদাস জামাতের বন্ধুদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। সদর সাহেব বলেন যে জামাতের বন্ধুরা গরীব। তারা নিজেদের সামর্থ অনুসারে চাঁদা দেয়। হুযুর আনোয়ার এর জিজ্ঞাসার উত্তরে সদর সাহেব বলেন যে, আল্লাহ্তাআলার ফযলে তিনি মুসী এবং ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় সামিল হয়েছেন। হুযুর আনোয়ার সদর খোদ্দামুল আহমদীয়াকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আহমদীয়াত কবুল করার পর আপনার মধ্যে কি পরিবর্তন এসেছে। সদর সাহেব বলেন, এখন আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি। মিটিং এর শেষে হুযূর আনোয়ার (আইঃ) প্রতিনিধি দলের প্রত্যেক সদস্যকে "আলাইসাল্লাহু বে কাফিন আবদাহু" সম্বলিত আংটি দেন। আর এর অর্থও তাদের বোঝান হয়। হুযূর আনোয়ার বলেন, এ আংটি মানুষদের এ কথা স্মরণ করানোর জন্য যে, খোদা মানুষের জন্য যথেষ্ট। সলোমন আইল্যান্ডের প্রতিনিধি দলের হুযূর আনোয়ার সাথে সাক্ষাতকার ও মিটিং ছটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

পারিবারিক সাক্ষাতকার

এরপর পারিবারিক ও একক ব্যক্তিদের সাক্ষাতকার শুরু হয়।

যা রাত সাড়ে আট টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ দিন অষ্ট্রেলিয়া জামাতের মেলবোর্ন, সিডনী এবং বিসব্রেন ছাড়া কেনাডা ও পাকিস্তান থেকে আগত বন্ধুরাও হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর সাক্ষাতের সম্মান পান। এ দিন সম্মিলিতভাবে ৫৫টা পরিবারের ১৪৫ জন সদস্য হুযূর আনোয়ার (আইঃ) সাথে সাক্ষাতের মর্যাদা এবং ছবি তোলার সৌভাগ্য লাভ করেন।

এ দিন সাক্ষাত প্রার্থীদের মধ্যে মেলবোর্ন এবং ব্রিসবেন থেকে আগত পরিবারগুলো হাজার হাজার কিলোমিটার দূরত্ব বার ঘন্টায় অতিক্রম করে এখানে পৌঁছায়। আজ সাক্ষাতকারীদের মধ্যে কিছু আহমদীয়াতের শহীদদের পরিবার, তাদের স্ত্রীগণ ও বাচ্চারা, আসীরাণে মাওলাদের (আল্লাহ্র পথে বন্দী) পরিবার অন্তর্ভূক্ত ছিল। যারা আজ তাদের প্রিয় খলীফার সাথে নিজেদের জীবনে প্রথমবার সাক্ষাত করছিল। তারা নিজেদের এ সৌভাগ্য এবং সম্মানের জন্য সন্তুষ্ট ছিল যে, আল্লাহ্তাআলা এই দুর দেশ হুযূর আনোয়ারের সাথে সাক্ষাতের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। হুযূর আনোয়ারের সাথে এ সাক্ষাত তাদের জন্য যেমন অস্বাভাবিক বরকতের কারণ ছিল তেমনি তাদের দুঃখী হৃদয়ের শান্তি এবং তৃপ্তি ও সুখের উপকরণ ও এ সাক্ষাতের ফলে সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্তাআলা এ বরকত, রহমত ও শান্তি তাদের সকলের জন্য চিরস্থায়ী করে দিন। আর তাদের সকলকে সব সময়ে নিজের হেফাযত ও শান্তির মধ্যে রাখুন। আমীন।

সাক্ষাতকারের পর পৌনে ন টার সময় হুযূর (আইঃ) পুরুষদের জলসাগাতে আসেন এবং মাগরেব ও এশার নামায জমা করে পড়ান। নামায আদায়ের পর হুযূর (আইঃ) নিজের বিশ্রাম স্থলে চলে যান। (চলবে)

রিপোর্ট–আব্দুল মজিদ তাহের

অনুবাদ–কওসার আলি মোল্লা

আমীর,
জামাত আহমদীয়া, বাংলাদেশ।
প্রিয় আমীর সাহেব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

গত ১৬ই ডিসেম্বর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আইঃ) মসজিদে আকসা, কাদিয়ানে এক ঐতিহাসিক খুতবা প্রদান করেন। এবারই প্রথম কাদিয়ান থেকে সরাসরি MTA এর মাধ্যমে খুতবা সম্প্রচার করা হয়।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যে, আমি মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর উত্তরাধিকারী খলীফা হিসেবে এ পবিত্র শহরে আপনাদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করছি। এ দিনটি আমার জন্য এবং জামাতের জন্য দুই দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর খলীফা হিসেবে এ প্রথম আমি এখানে এসেছি। দ্বিতীয় কারণটি বিশ্বব্যাপী জামাতের জন্য এক বিরাট খুশী ও আধ্যাত্মিক আনন্দের বিষয়। আজ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী যা পূর্বেও বহুবার পূর্ণ হয়েছে সেটি পুনরায় নতুন গৌরব ও মর্যাদার সাথে আরও একবার পূর্ণ হচ্ছে। আজ MTA এর মাধ্যমে এ খুতবা সারা পৃথিবীতে কাদিয়ান থেকে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে। MTA আল্লাহ্‌র দান। এটি মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে আমরা পেয়েছি। আল্লাহ্ করুন MTA যেন মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সুসংবাদ পৃথিবীব্যাপী প্রচারের মাধ্যম হিসেবে সর্বদা বিদ্যমান থাকে।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ হিন্দুস্তানে আগমনের পর থেকে আমাকে বহুবার কাদিয়ান সফরের অনুভূতি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আমার জবাব হচ্ছে কাদিয়ানে যেহেতু মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর নিজের শহর, প্রত্যেক আহমদীর হৃদয়ে এ শহরের প্রতি এক বিশেষ ভালবাসা রয়েছে। পার্থিব ভালবাসার মত ক্ষণস্থায়ী আবেগের বিষয় নয়। অন্যদিকে একজন আহমদী, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে যার সত্যিকার ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে–তার অনুভূতি সাময়িক নয়। এ অনুভব এক আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায় একজনের মধ্যে প্রবাহিত হয়। কাদিয়ানের বাসিন্দাগণ ভাগ্যবান, কারণ এর অলিগলি মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পায়ের পরশ লাভ করেছে। আপনাদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছেন যারা এ কাদিয়ানের নিরাপত্তার জন্য সবকিছু কুরবানী করার শপথ করেছিলেন এবং নিজেদের শপথ উত্তমরূপে পূর্ণ করেছিলেন এবং দুনিয়াবী সুখ-সুবিধার বদলে ধর্মকে বেছে নিয়েছিলেন। কাজেই এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য এই যে, দুনিয়া লাভ করাই যেন তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য না হয়। কাদিয়ানের দরবেশগণ, তাদের বংশধরগণ এবং যারা এখানে নতুন করে বসবাস করতে এসেছেন তাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক যেন অন্যদের নিকটও দৃশ্যমান হয়। আর এটি তখনই ঘটবে যখন আপনারা আল্লাহ্‌র ক্ষমা লাভের জন্য এবং নিজেদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের জন্য সচেষ্ট হবেন। ফলে আল্লাহ্ ও এমন লোকদের জন্য নিদর্শন প্রকাশ করবেন এবং তিনি (আল্লাহ্) স্বয়ং তাদের আধ্যাত্মিক ও দুনিয়াবী প্রয়োজন মেটাবেন।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ এখানে কাদিয়ানে এমন একজনও থাকা উচিত নয় যার কারণে অন্যরা হোঁচট খায়। তরুন প্রজন্মকে সেই উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে হবে যার জন্য তাদের পূর্বপুরুষরা কুরবানী করেছিলেন। তারা যেন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ত্যাগ করেন।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র হক আদায়ের সাথে সাথে আমাদের আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের ইবাদত তখনই আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হবে যখন আমরা মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করব। এভাবে ফরয ইবাদত ছাড়াও আল্লাহ্‌র উপাসনার মধ্যে মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন, জামাতের নেযামের আনুগত্য এবং ব্যক্তির কর্তব্য পালন ও অন্তর্ভুক্ত। চলুন আমরা চেষ্টা করি এসকল কর্তব্য কাজের মধ্যে একটিতেও যেন আমরা ব্যর্থ না হই। অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করাই আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ লাভের উপায়।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ আসুন আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে পরীক্ষা করে দেখি আমরা কি ভুল করার পর আল্লাহ্‌র নিকট আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করি, অথবা তার সাহায্য চাই, এবং পুনরায় সে ভুল না করার প্রতিজ্ঞা করি?

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ কাদিয়ানের আহমদীগণ ভালবাসা এবং আত্মউৎসর্গে পরিপূর্ণ। আল্লাহ্‌তাআলা তাদের এ ভালবাসা ও আত্ম উৎসর্গকে আরও বাড়িয়ে দিন। সারা পৃথিবীর দৃষ্টি এখন কাদিয়ানের দিকে। আজ পৃথিবী আপনাদের সরাসরি দেখছে। কাজেই আপনাদের তাক্‌ওয়ার মান বাড়াতে হবে। মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বাণীকে আপনারা পূর্বের চেয়ে উত্তমরূপে অনুধাবন করুন এবং অন্যদের নিকট পৌছে দিন। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, আপনাদের বাস্তব চারিত্রিক নমুনা যেন আপনারা যে বার্তা পৌঁছাতে চান তার স্বাক্ষ্য বহন করে।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ পৃথিবীব্যাপী অনেক আহমদী এখানে আমাদের সাথে যোগদানের জন্য আকাংখা করছেন। কিন্তু তাদের অনেকে ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। আল্লাহ্‌তাআলা অসুবিধা সমূহ দূর করে দিয়ে তাদের আকাংখা পূরণ করুন। আপনারা খেয়াল করবেন যে, এখানে আয়োজন ও সুযোগ-সুবিধা সীমিত। সুতরাং অন্যান্য দেশ থেকে আগত মেহমানগণ তাদের সাথে বিছানাপত্র নিয়ে আসবেন। মনে রাখবেন এখানে থাকার জায়গাও সীমিত এবং মেহমানদের কিছুটা কষ্ট সহ্য করতে হবে।

হুযূর (আঃ) দোয়া করেন যেন মেহমানরা নিরাপদে এসে পৌঁছেন এবং সত্যিকার অনুতাপ ও এস্তেগফারের উপলব্ধি নিয়ে আসেন। আমীন।

অনুগ্রহপূর্বক হুযূর (আইঃ) প্রদত্ত এ নির্দেশনা আপনার জামাতের সদস্যদের নিকট পৌঁছে দিন।

জাযাকুমুল্লাহ।

ওয়াস্‌সালাম

(ইফতেখার আলী কোরায়শী)
ভারপ্রাপ্ত উকিল আ'লা
আঞ্জুমান আহমদীয়া, পাকিস্তান
তারিখঃ ২৪ ডিসেম্বর ২০০৫ইং
অনুবাদক ঃ বশীর উদ্দীন আহমদ

আহমদীয়া বিরোধী সংবাদের প্রতিবাদ

গত ২৮শে জুলাই ২০০৬ দৈনিক 'যায়যায়দিন' পত্রিকা "কাদিয়ানি বিরোধীদের অর্থ যোগায় কাদিয়ানীরাই" শিরোনামে অসত্য, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত এক রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত রিপোর্টির ব্যাপারে তাদের বক্তব্য সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় প্রতিবাদ পাঠালেও পত্রিকাটি তা না ছাপানোয় ৩১শে জুলাই '০৬ তারিখে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ তাদের প্রতিবাদ দেশবাসীর সামনে ব্যক্ত করেন।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনের সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়। গত এক সংখ্যায় আমরা প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ ছাপিয়ে ছিলাম। এবার পাঠকদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত সংবাদগুলোর আরও কয়েকটি এখানে প্রকাশ করা হলো।

ভোরের কাগজ

ঢাকা মঙ্গলবার ১ আগস্ট ২০০৬

আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সংবাদ সম্মেলন

কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে নিজেদের বিরুদ্ধে উগ্রবাদীদের লেলিয়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না

কাগজ প্রতিবেদক : 'কাদিয়ানিবিরোধীদের অর্থ জোগায় কাদিয়ানিরাই' শিরোনামে গত ২৮ জুলাই দৈনিক যায়যায়দিনে প্রকাশিত সংবাদে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। গতকাল সোমবার রাজধানীর বকশীবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংখ্যালঘু এই সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, তাদের বিরুদ্ধে উগ্রপন্থী সংগঠনগুলোর গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এমন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বলে নেতৃবৃন্দ আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সংবাদ সম্মেলনে তারা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন ধর্মের নামে উগ্রতাকে বিসর্জন দিয়েই আমরা আহমদি হয়েছি। আর আহমদিয়া মুসলিম জামাত পরিচালিত হয় এ সম্প্রদায়ের মানুষের কষ্টার্জিত আয় থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদত্ত অনুদানের দ্বারা। সুতরাং কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে আহমদিয়ারা তাদের বিরোধী ও উগ্রবাদীদের নিজেদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে এমন সংবাদ হাস্যকর ও অযৌক্তিক।

সংবাদ সম্মেলনে তারা আরো বলেন, ২৮ জুলাই সংবাদ প্রকাশের পর গত দুদিন পরপর প্রতিবাদলিপি পাঠানোর পরও যায়যায়দিন তা প্রকাশ না করায় এ সংবাদ সম্মেলন ডাকতে বাধ্য হয়েছেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারি কাওসার আলি মোল্লা, সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ভারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল আমির মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, মিশনারি ইনচার্জ আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এ কে রেজাউল করিম প্রমুখ। ন্যাশনাল আমির আন্তর্জাতিক সালানা জলসায় অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাজ্য থাকায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

কাওসার আলি মোল্লা বলেন, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ বিশ্বের ১৮৫টি দেশে শান্তিপ্রিয়, আইনমান্যকারী ও নিরীহ ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে স্বীকৃত। সংবাদটির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সংবাদের শিরোনামে চমক সৃষ্টি করলেও তাতে কেবল কাল্পনিক ও মনগড়া কথাই বলা হয়েছে। সংবাদটিতে বলা হয়েছে– বাংলাদেশকে জঙ্গিকবলিত ও উগ্রবাদী রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করার টার্গেট নিয়ে এ সম্প্রদায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনকে অর্থ দিয়ে থাকে। তারা বলেন, আমরা বারবার বলেছি আহমদিয়াবিরোধী চলমান আন্দোলনে এ দেশের সাধারণ মানুষ যুক্ত নয়। কিন্তু কিছু উগ্রবাদীর কারণে দেশের ভাবমূর্তি আজ হুমকির সম্মুখীন।

ঐ পত্রিকার বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেবেন কি না এমন প্রশ্ন করা হলে জবাবে মিশনারি ইনচার্জ আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বলেন, 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো তরে' এই আদর্শকে ধারণ করে আমরা আহমদিয়া হয়েছি। আমরা একটি নিরীহ ধর্মীয় সম্প্রদায়। কোনো মামলার কথা আমরা ভাবতেও পারি না।

প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ১ আগস্ট ২০০৬, ১৭ শ্রাবণ ১৪১৩

আহমাদিয়া নেতাদের উদ্বেগ

ভিত্তিহীন সংবাদ দেশে আহমদিয়াদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

"ভালোবাসা সবার তরে; ঘৃণা নয় কারও ওপর'—আহমদিয়া সম্প্রদায়ে যোগ দিতে হলে সবাইকে এই মূলনীতি মেনে চলতে হয়। ধর্মের নামে সব ধরনের নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ও অশান্তি বর্জন করেই আমরা আহমদিয়া হয়েছি। এরপরও আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে সন্ত্রাস করানোর মতো আত্মহননমূলক কাজ করব?"

গত শুক্রবার দৈনিক *যায়যায়দিনে* 'কাদিয়ানিবিরোধীদের অর্থ জোগায় কাদিয়ানিরাই' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের আহমদিয়া মুসলিম জামাত নেতারা এসব কথা বলেছেন।

গতকাল সোমবার রাজধানীর বকশীবাজারে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আহমদিয়া নেতারা জানান, তারা *যায়যায়দিনে* প্রতিবাদপত্র পাঠালেও পত্রিকাটি তা না ছাপানোয় বাধ্য হয়েই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বাংলাদেশে আহমদিয়া ইস্যু একটি কৃত্রিম ইস্যু। এরপরও এ ধরনের ভিত্তিহীন সংবাদ দেশে আহমদিয়াদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে।

যুগান্তর

মঙ্গলবার, ১৭ শ্রাবণ ১৪১৩
Tuesday, 1 August, 2006

একটি মহল আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে জনরোষ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছে

● সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

উগ্র-ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাল আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আহমদিয়া সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, তাদের বিরুদ্ধে জনরোষ সৃষ্টি করতে একটি চিহ্নিত মহল গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আহমদিয়া-বিরোধী চলমান আন্দোলনে দেশের আপামর জনসাধারণের কোন সম্পৃক্ততা নেই। অথচ অল্প কিছুসংখ্যক উগ্র-ধর্মান্ধ নেতাকর্মীর প্ররোচনায় দেশের ভাবমূর্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আজ হুমকির মুখে। চিহ্নিত এ মহলটির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে হঠাৎ গোটা বিষয়টিকে আহমদিয়াদের কাঁধে চাপানোর অপচেষ্টা চলছে।

২৮ জুলাই দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকায় আহমদিয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশকে জড়িয়ে 'কাদিয়ানী-বিরোধীদের অর্থ যোগায় কাদিয়ানীরাই' শীর্ষক প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। সোমবার সংগঠনের ৪ বকশীবাজার রোডের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ যায়যায়দিনে প্রকাশিত রিপোর্টটিকে গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ উল্লেখ করে বলেন, তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রতিবেদন প্রকাশের দিনেই তাৎক্ষণিক একটি প্রতিবাদ পাঠানো হয়। তা প্রকাশিত না হওয়ায় পরদিন আবারও প্রতিবাদলিপি ফ্যাক্স করা হয়। তাও প্রকাশ করেনি যায়যায়দিন। এ ব্যাপারে আইনগত কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না— দৃঢ়তার সঙ্গে এ কথা জানিয়ে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, পত্রিকার পলিসিগত কোন কারণে কোথাও হয়তো কোন ভুল হয়েছে। আশা করছি এ ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে।

Tuesday, August 1, 20(

NEW AGE

Ahmadiyyas react strongly to news report

Staff Correspondent

LEADERS of the Ahmadiyya community on Monday dismissed as propaganda a report that they were themselves sponsoring anti-Ahmadiyya attacks with a view to portraying Bangladesh as an extremist state.

Certain quarters are trying to portray Bangladesh as an extremist state and putting the blame on the Ahmadiyyas, they said at a press conference.

The Ahmadiyya community raises funds from its members to run its activities, they said.

The propaganda that the fund is being used to sponsor anti-Ahmadiyya elements is part of a deep-rooted conspiracy, they added.

Such an accusation is not brought against the Ahmadiyyas even in Pakistan, which is dominated by fundamentalists, they said.

The Ahmadiyya leaders referred to the lead report of a Bangla daily on July 27 and said they had sent several rejoinders against the report.

However, the daily did not respond to the rejoinders, compelling them to hold the press conference, they added.

'Ahmadiyyas have been blamed for showing videos of repression on them to portray the nation as extremists and terrorists, they said.

The reality, they said, is that in an age of global interconnectivity, any sensitive incident gets instant coverage.

Most of the people in Bangladesh have no support for let alone involvement in, the anti-Ahmadiyya movement, Abdul Awal Khan Chowdhury, chief missionary of the community, said.

'People here are pious but not fanatic. A few hatred-preachers' activity tarnished the image of the nation across the globe but no action has been taken against them and the ploy to put all the responsibility on us seems to be a part of a deep conspiracy and attempt to protect those culprits,' he said.

He said the Ahmadiyyas were not yet planning legal action against what they called was propaganda. 'But, as a citizen of the country, every Ahmadiyya has the right to seek legal support.'

Mohammad Shahabuddin Ahmed, Kowser Ali Mollah and AK Rezaul Karim were present at the press conference.

আমি মুসলমান–আমার ধর্ম ইসলাম

(দ্বিতীয় কিস্তি)

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের মুক্তাঙ্গনে ইসলামী ঐক্যজোটের কর্মসূচীতে যখন আহমদী মুসলমানদেরকে দেশের সরকারের কাছে অমুসিলম ঘোষণার অনৈসলামিক ও রাজনৈতিক দাবী উত্থাপন করা হচ্ছিল, সে সময়ে ১৮ই আগষ্ট ২০০৬ তারিখে খ্রীষ্ট ধর্মের পাদপীঠ লন্ডনের মর্ডেন এলাকায় 'বায়তুল ফুতুহ' মসজিদে বিশ্ববাসী ও উপস্থিত মুসল্লীদেরকে উদ্দেশ্য করে খুতবা দিচ্ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান প্রধান ও খলীফা হযরত মীর্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)। খুতবায় তিনি আমাদের প্রিয় নবী নেতা ও রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মোকাম ও মর্যাদা যে কত উচ্চে ছিল তার বয়ান করছিলেন। তিনি আল-কুরআনের 'কুল ইন কুন্তুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবেওনী ইউহ্ বিব্কুমুল্লাহ্' (আলে ইমরান-৩২) আয়াতের ব্যাখ্যা করেছিলেন। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাসতে চাও তবে এ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ভালবাস। তাঁকে অনুসরণ কর। তাঁর অনুকরণে সচেষ্ট হও। এ খুতবায় তিনি এরশাদ করেছিলেন–আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মার খেয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত হয়েও কখনো কারো জন্য বদদোয়া করেননি। কোন মানুষের অকল্যাণ কামনা করেননি, তাঁর (এ নবীর) জীবনাদর্শ স্মরণ করলে দেখা যায় কাফেরদের মোকাবেলায় কি অভূতপূর্ব প্রত্যয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সাহায্য কামনায় তিনি দোয়া করেছেন! দোয়ার কবুলিয়তের পর তিনি হাত নামিয়ে তাঁর অনুসারীদের কাছে সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁর দোয়া আল্লাহ্ এমনিভাবে কবুল করেছেন যে, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ দুর্বল খোড়া প্রশিক্ষণবিহীন যবুথবু ৩১৩ জন সাহাবীকে হাজারো সুশিক্ষিত কাফের সেনাদের মোকাবেলায় বিজয় দান করেছেন।

লন্ডন থেকে যখন স্যাটেলাইটে এ খুতবা পৃথিবীর দু' গোলার্ধেই প্রচারিত হচ্ছিল, তখন রাজধানী ঢাকার মুক্তাঙ্গনে চলছিল আহমদীয়া মুসলমানদেরকে অমুসলিম ঘোষণার জন্য একদল কওমী মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের মূহুর্মুহু চীৎকার ও দাবীর শ্লোগান।

আমি আগেই বলেছি, আমি মুসলমান আমার ধর্ম ইসলাম। আমি এসব কাজকে অনৈসলামিক বলে জানি। আমি বা আমরা (আহমদী মুসলমান) আমাদের প্রিয় নবী ও নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শ ও ধৈর্যে বিশ্বাসী; আমরা পৃথিবীর উন্নত মানুষ বানানোর এ মহাকারিগরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ ও তাঁর খাঁটি উম্মত।

আজ বাংলাদেশে কিছু অজ্ঞ উলামাবৃন্দ সরকারীভাবে আমাদের ধর্মবিশ্বাসকে বিকৃতভাবে তুলে ধরার ঘৃণ্য অপচেষ্টায় লিপ্ত। তারা ইসলামের নামে আমাদের বাড়ীঘরও মসজিদে হামলা চালিয়েছে। তাদের অনুসারীরা আমাদের জমির ফসল কেটে নিয়েছে। আমাদের সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করেছে, মসজিদে ঢুকে বোমা মেরে হত্যা করেছে, নিজ গৃহের বারান্দায় পিটিয়ে শহীদ করেছে আমাদের এক ইমাম সাহেবকে। সবটাই করেছে ধর্মের নামে, ইসলামের নামে। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর শেষ নবুওয়ত রক্ষা করার নামে। নাউযুবিল্লাহ্। হযরত রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে তারা ও তাদের মিথ্যাচারে পরিচালিত তাদের দোসরদেরকে নিয়ে তারা এসব অঘটন ঘটিয়েছে।

পাঠক! এ হাদীসবেত্তাগণ ভুলে গেছেন যে, বাংলাদেশের আহমদী মুসলমানদের উপর ইসলামের দোহাই দিয়ে এ সব বিভ্রান্তরা যে অত্যাচার, নিপীড়ণ এবং হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। স্মরণ করে দেখুন, সে যুগে মক্কায় সমাজপতি, ধনাঢ্য ও বুদ্ধিমানেরা এমন করেই আমাদের প্রিয় নবী মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তার অনুসারীদেরকে ও সাহাবায়ে রেজুয়ানে আলাইহিমদের কষ্ট দিত। অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত হয়েও আমরা এসব উলামা মাশায়েখ হাদীসবেত্তা বিভ্রান্ত মুসলমানদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মত দোয়া করি–'আল্লাহুম্মাহ্দে কাউমেহী লা' ইয়ালামুন।

অথচ সব হাদীসবেত্তা নায়েবে রসুলগণ গত দু'দশক থেকেই বাংলাদেশের ব্রহ্মণবাড়ীয়া জেলায় আমাদের নিজস্ব সম্পত্তিতে আমাদের নিজেদের অর্থে নির্মিত মসজিদগুলো থেকে আমাদেরকে বের করে জবর দখল করে রেখেছে। কি চমৎকার রসূল প্রেম (?) হযরত নবী (সঃ) কি এসব কাজের শিক্ষা রেখে গেছেন এসব উলামা মাশায়েখ রসূল প্রেমিকদের জন্য? তাহলে, কি করে এ ইসলাম শান্তির ধর্ম? এ-তো জবরদখল আর সন্ত্রাসের ধর্ম। আমি আবারও বলছি–আমি মুসলমান, আমার ধর্ম ইসলাম। আল্লাহ্র রসূল হযরত মুহাম্মদ আরবী (সঃ) যেভাবে রুকূ, সেজ্দা করে নামায পড়তে শিখিয়ে গেছেন, আমি এবং আমরা (আহমদী মুসলমান) সেভাবে মক্কার কাবামুখী হয়ে নামায পড়ি, কাবাগৃহ তাওয়াফ করে হজ্ব করি। আমরা সেসব গৃহে বাজামা'ত নামায আদয় করি, তা' আমাদের নবী নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যেরূপ গৃহে পড়তেন, তাঁর অনুকরণে এবং অনুসরণে নির্মিত হয়। আমরা এসব মসজিদে নামাযে রুকূ সেজ্দা করি। আমার এখানে প্রশ্ন–আমরা আহমদী মুসলমানরা এ মসজিদে নামায পড়লে এটি মসজিদ হয় না। অথচ আমাদের নির্মিত মসজিদগুলোতে এ উলামা হাদীসবেত্তাদের নামায হয় কিভাবে? তারা এ বিষয়ে ফতোয়াটা কোথা থেকে আমদানী করেছেন–কোন্ হাদীসে তাদেরকে এ মহাকর্মের অধিকার দেয়া হয়েছে? এ হাদীসের বর্ণনাকারী কোন্ রাবী? এসব অনাচার ঘটছে সবার চোখের সামনে। আর আমাদের দেশের সাধারণ ধর্মভীরু মানুষগুলোর অবস্থাটা 'বিড়াল দেখলে যেমন কবুতর চোখ বুঁজে বিড়ালের মুখের গ্রাস হয়', সে অবস্থার মতো। আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক দলই নির্বাচন করে সরকার গঠন করে না কেন, আমার তো মনে হয়, তারা টুপি

দেখে ভোট গুণে। তারা অনাচার অবিচারের হিসেব করার সময় পায় না ক্ষমতাসীন থাকলে।

পাঠক! একবার ভেবে দেখুন, এ হাদীস বিশারদ উলামাদের একাংশ আহমদী মুসলমানদেরকে 'কাদিয়ানী' নামে প্রচার করছে। আমি বা আমরা যাকে ইমাম মাহদী (আঃ) মানি, আমি আগেই বলেছি, তিনি কাদিয়ানে জন্মলাভকারী, তিনি নিজে কাদিয়ানী। আমার বাড়ী বাংলাদেশে; আমি কেন কাদিয়ানী হবো? আমি বা আমাদের কাদিয়ানী বলা কি ইসলাম সম্মত বা আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআনের শিক্ষা মোতাবেক? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক কাউকে বিকৃতভাবে সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে গালি দিলে, যে গালি দেয় সে ফাসেক হয়ে যায়, আর মুসলমান, মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করলে, সে কাজ কাফেরের কাজ বলে গণ্য হয়। এসব হাদীস বিশারদ নেতৃবৃন্দ কি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ) এর এসব আদেশ নিষেধ নিজেরা মেনে চলছেন?

পাঠক! চিন্তা করে দেখুন–**এরা নিজেরা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের শিক্ষা ও হাদীসের অনুসারী নয়। এরা পাক কুরআনকে তাদের পিঠে ফেলে দিয়েছে।** প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সুন্দর ইসলাম কখনও বিদ্রোহকে সমর্থন করে না। অত্যাচারিত হলে, দোয়া করে আল্লাহ্‌র কাছে অত্যাচার থেকে মুক্তি কামনা করে। প্রত্যেক জুমুআর নামাযে খুতবা সানীয়াতে মুসল্লীদেরকে এ কথাটি স্মরণ করানো হয়। চরম ধৈর্য্য প্রদর্শনের মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলাম কায়েম হয়েছে, প্রসার লাভ করেছে। চলমান সময়ে আমাদের উলামা-মাশায়েখদের কার্যাবলীতে কি বিদ্রোহ না করা বা ধৈর্য প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়?

আমাদের দেশে এখন মাদ্রাসা শিক্ষাকে শুধুমাত্র তাদের নিজেদের জীবন-জীবিকার স্বার্থে ব্যবহার করছে। এসবের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই, তাদেরকে ধর্মীয় নেতা বলা কতটা ঠিক হবে, সে বিবেচানার ভার পাঠকদের কাছে রইল। আমাদের শায়খুল সাহেবরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নিজেদের আধিপত্য পাকাপোক্ত করার চেষ্টায় রত। এমনিতে সমাজ জীবনে তারা ক্ষুদ্র পরিসরে তাদের একটা অবস্থান করে রেখেছে। এদের ছাড়া কেউ ইমামতি করতে পারে না, জুমুআর খুতবা দিতে পারে না, কেউ বিয়ে পড়াতে পারে না, মরলে মাইয়েতের গোসল দিতে পারে না, জানাযার নামায পড়াতে পারে না। মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে এরা ছাড়া অন্যেরা কুরআন পড়লে বাড়ীর পাপ মোচন হয় না। এরা মুর্দার বেনামাযী জীবনের কাফ্‌ফারা গুনে এবং নিজেরা তা' নির্দ্বিধায় ভোগ করে। গ্রামে মাতবর হতে পারে, যে কেউ এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদে মেম্বার হতে পারে, চেয়ারম্যান হতে পরে, এমনকি এম,পি, মন্ত্রীও হতে পারে। কিন্তু নামাযের ইমামতি, কুরআন পাঠের অধিকার–এসব শায়খূলদের অনুসারীদের বাইরে কেউ হতে পারে না। এবার দেখুন, এরা কিভাবে কায়দা করে আমাদের সমাজকে সাপটে ধরে রেখেছে।

তাই আমার মনে হয়, আমাদের দেশের হাদীস বিশারদরা, ইসলামের নামে, শান্তির ধর্মের দোহাই দিয়ে, তারা তাদের কর্ম দিয়ে ধর্মের কপালে কালিমা লেপন করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত। বাংলাদেশে তারা পাকিস্তানী ভাবধারার ইসলামকে আত্মস্থ করিয়ে সরকারীভাবে আহমদী মুসলমানদেরকে অমুসলিম ঘোষণার জন্য আন্দোলন করছে। সাধারণ মানুষদেরকে বুঝানো হচ্ছে, এরা (আহমদীরা) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে মানে না। আমি ভেবে পাই না এমন মিথ্যা কেমন করে তারা সত্যের মত প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। অথচ আমরা বার বার বলছি আমাদের নেতা খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সঃ), আমাদের কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্'।

আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য তারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিদেশীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। এ অর্থে সমাজের ও দেশের শান্তি বিঘ্নিত করছে এরা। সাপের বিষ অল্পতেই যেমন মানবদেহে ক্ষতির জন্য যথেষ্ট, আহমদী মুসলিমদের নিয়ে তাদের এ আন্দোলন বাংলাদেশের শান্তি, শৃংঙ্খলা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংসের জন্য তেমনই যথেষ্ট। ওদের অর্জিত বিদ্যা, জীবন-জীবিকার জন্য পূর্ণ নয়, পাশাপাশি এসব শয়তানী কর্ম তাদের উন্নত, আয়েশী জীবনের যোগানদার। যে সাদকা, খয়রাত দিয়ে আমাদের পাক নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিজের উদর পুর্তি করেননি, সে সদকা খয়রাত এসব শায়খুল ও তাদের অনুসারীদের বেড়ে উঠার উপকরণ–এ প্রকাশিত সত্য। আমার ভাবতে অবাক লাগে–আমাদের ধর্মভীরু মানুষগুলো কেমন করে সদকা খয়রাতে বেড়ে উঠা ইসলামী খোল্‌সে আবৃত এসব মানুষগুলোকে আজো বিশ্বাস করে চলেছে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আমাদের প্রিয় খাতামান্নাবীঈন হযরত রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী–**"উলামায়ুহুম শাররুম্মান তাহতা আদিমেস্ সামায়ে, মিন্‌স এনদেহিম তাখরুজুল ফিৎনাতো ওয়া ফিহিম তাউদ।"** (মেশকাত-কিতাবুল এলম) অর্থাৎ তখনকার আলেমরা আকাশের নীচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে, তাদের মধ্য থেকেই সমস্ত ঝগড়া বিবাদ উঠে আসবে এবং তাদের মাঝেই ফিরে যাবে। **পাঠক! শুধু মিলিয়ে দেখুন–এখন এসব আলেমকুলের কর্মকান্ড এ ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ করে চলছে।**

নিজেরা বিদ্যাটা নিজের মাঝেই ধরে রাখার ফন্দিফিকিরে ব্যস্ত। সমাজের বা রাষ্ট্রের কোন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তাদের যেমন কোন ইন্টারেষ্ট নেই, তেমন তাদের কোন সম্পৃক্ততাও নেই। আমার মনে হয়, উন্নয়ন ও গঠনমূলক চিন্তা থেকে তাদের মস্তিষ্ক অনুপস্থিত তাদের মানসিকতা সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে চলেছে, এরা দেশের আইন মানতে চায় না-বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা করে।

তাই বর্তমান সমাজকে, এ প্রজন্মকে এসব বিভ্রান্ত উলামাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে হবে, তাদের সৃষ্ট বিশৃংখলা থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজতে হবে, অন্যায়কে পরিহার করে সত্য ও পুণ্যের আলোকিত পথে চলতে হবে। তাহলে এ সমাজ, এ প্রজন্ম যাবতীয় নৈতিক বিভ্রান্তি ও অবক্ষয় থেকে সুরক্ষা পাবে।

আলহাজ্জ এ কে রেজাউল করীম

সদৃশ-বিধান চিকিৎসা

হযরত মির্যা তাহের আহমদ

১৯৯৭-১৯৯৮ এরপর দু'বছর হুযূর আকদস (আইঃ)-এর এমটিএ-তে সম্প্রচারিত হোমিও ক্লাসগুলোর সংকলন পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এ সংকলন প্রকাশিত হবার পর হুযূরের (আইঃ) সেগুলি মনঃপুত হয়নি। তাই এর আগে পাক্ষিক আহমদীতে ধারাবাহিক 'হোমিও প্যাথি' সদৃশ বিধান চিকিৎসা'র অনুবাদ কয়েক সংখ্যায় ছাপানোর পর তা বন্ধ রাখতে হয়। ১৯৯৯-তে নতুন সংশোধিত আকারে ও বর্ধিত কলেবরে হুযূরের এ বইটি মুদ্রিত হয়েছে। এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে এর অনুবাদ ছাপানো হবে ইনশালাহ্।
–অনুবাদক

ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধকল্পে EUPATCR. PERF. 200 ব্যবহার করুন ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিলেও এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ভূমিকা ঃ

হোমিওপ্যাথিতে আমার আগ্রহ জন্মানোর পেছনে মজার ঘটনা রয়েছে। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান হবার প্রথম দিকের কথা। আমার তখন ঘন ঘন মাথা ব্যাথার প্রচন্ড আক্রমণ হতো। ইংরেজীতে একে 'মাইগ্রেন' (MIGRAINE) উর্দূতে একে 'দারদে শাক্বীক্বাহ্' বলে। এতে তীব্র ব্যথা হয়, একই সাথে বমনেচ্ছা, বমি আর স্নায়বিক অস্থিরতা থাকে। চিকিৎসাস্বরূপ আমি 'এসপিরিন' ব্যবহার করতাম যার ফলে পাকস্থলীর ঝিলি আর কিডনী/মূত্রাশয়ে মন্দ প্রভাব পড়তো আর সেই সাথে হৃদ স্পন্দনও বেড়ে যেতো। আমার মরহুম পিতা একটি এলোপ্যাথিক ঔষধ 'SANDOL' নিজের কাছে রাখতেন যা তাঁরও কাজে লাগতো। উপমহাদেশের বিভক্তির পর এ ঔষধ পাকিস্তানে পাওয়া যেতো না বরং কোলকাতা থেকে আনতে হতো। এটা ব্যবহারে আমি স্বস্তি লাভ করতাম।

একবার যখন প্রচন্ড মাথা ব্যথা আরম্ভ হয় তখন মরহুম আব্বাজানের কাছে 'SANDOL' ছিল না। তাই তিনি তার বদলে একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পাঠিয়ে দেন। তখন হোমিওপ্যাথির উপর আমার কোন আস্থা ছিল না। কিন্তু 'তাবারুক' মনে করে আমি ঔষধটা খেয়ে নিই। হঠাৎ আমার উপলব্ধি হলো, অকারণেই চোখ বুজে শুয়ে আছি অথচ মাথা ব্যাথ্যা একেবারেই শেষ। ইতঃপূর্বে কোন ঔষধ আমার উপর এত দ্রুত আর এত অসাধারণভাবে প্রভাব বিস্তার করেনি!

এরপর আরেকটি ঘটনা হোমিওপ্যাথিতে আমার আগ্রহ সৃষ্টির কারণ হয়। যখন আমার বিয়ে হয়, তখন আমার স্ত্রী আসেফা বেগম (রাহেমাহাল্লাহু)-এর একটি পুরানো রোগ ছিল, যার কথা তিনি আমাকে জানালেন। হযরত আব্বাজানের কাছে হোমিওপ্যাথির বই ছিল অনেক। আমি সেগুলো ঘেঁটে একটি ঔষধ বের করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আল্লাহ্তাআলার আশ্চর্য পরিকল্পনা দেখুন! প্রথম বইটির যে স্থানে আমি পাতা খুললাম সেখানে নেট্রাম মিউর (NATRUM MUR)-এর বর্ণিত লক্ষণাদি আসেফা বেগম বর্ণিত লক্ষণাদির অবিকল অনুরূপ ছিল। আমি তাঁকে উচ্চ মাত্রায় সেই ঔষধ দিই। ঔষধটি একবার সেবনেই তিনি এমন আরোগ্য লাভ করেন যে, সারা জীবন তাঁর আর সেই ব্যাধিটি দেখা দেয়নি। এতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নিল, আমি বুঝি বা না বুঝি হোমিওপ্যাথিতে অবশ্যই উপকার হয়, এর মাঝে অবশ্যই এক বাস্তব সত্য নিহিত। এরপর থেকে আমি হযরত আব্বাজানের লাইব্রেরী থেকে হোমিওপ্যাথি বই নিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করলাম। কখনও সমস্ত রাত ধরে সেগুলোকে পড়েছি। দীর্ঘ সময়ব্যাপী পড়াশুনা করে আমি ঔষধ ও সেগুলোর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হই। এদের ব্যবহার বিধি ও লক্ষণাদি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার পর আমি রোগীদের চিকিৎসা আরম্ভ করি।

হোমিওপ্যাথি আবিষ্কার ও এর আবিষ্কারক হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারকের নাম ডাক্তার হ্যানিম্যান যিনি ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে - SAXONY -জার্মানী-তে জন্ম নেন। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল স্যামুয়েল ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিক হ্যানিমান (SAMUEL CHRISTIAN FRIEDRICH HANNEMANN)। বিভিন্ন ভাষা শেখার বিষয়ে তাঁর ছিল বিপুল আগ্রহ। এর ফলে, তিনি আটটি ভাষা রপ্ত করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র বারো বছর, তখন তিনি গ্রীক ভাষা পড়ানো আরম্ভ করেন। এভাবে, তিনি ছোট বয়সেই বিবিধ ভাষার শিক্ষক হয়ে যান। তিনি অষ্ট্রিয়ার LIPZIG (লিপযিক) নগরীতে ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সেখান থেকে তিনি VIENNA (ভিয়েনা) যান আবার সেখান থেকে ERLANGEN (এরলাঞ্জেন) গমন করেন। অধ্যয়ন শেষে এখানে ১৭৭৯ সনে তিনি ডাক্তার হন আর DRESDEN (ড্রেসডেন)-এ ডাক্তারী প্র্যাক্টিস আরম্ভ করেন।

ডাক্তারী প্র্যাক্টিসকালে দরিদ্রদের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করার কারণে তাঁর আয় বেশি ছিল না। তাই ডাক্তারীর পাশাপাশি তিনি তাঁর অনুবাদ কর্মও অব্যাহত রাখেন। এলোপ্যাথিক ডাক্তার হবার এগার (১১) বছর পর তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ছয় বছর পর্যন্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি নিজের আর নিকট আত্মীয়স্বজনের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে থাকেন। ১৭৯৬ সালে ডাক্তারী সাময়িকী ও পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে প্রথম বারের মত তিনি তাঁর হোমিওপ্যাথিক দর্শন সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন। ১৮১০ সালে তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত মেডিকেল বই ORGANON OF RATIONAL MEDICINE প্রকাশ করেন যাকে হ্যানিম্যানের অরগনেন-ও বলা হয়। ১৮১১ থেকে ১৮২১ সনের মধ্যে তিনি মেটিরিয়া মেডিকা (Medica) প্রস্তুত করেন। সে সময় প্রচলিত পদ্ধতির অনুসারী সব চিকিৎসকরা তাঁর প্রচন্ড বিরোধিতা আরম্ভ করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বিরোধীদের চাপে সরকার তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিকে বেআইনী ঘোষণা করে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা

গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বেই হ্যানিমান অষ্ট্রিয়ার রাজকুমার কার্ল শাওয়ারমানবার্গ (KARL SCHWARZENBERG) -কে লিপযিকে ডেকে এনে তার সফল চিকিৎসা করেন। এ চিকিৎসায় রাজকুমার এতই উপকৃত হয় যে, সে অষ্ট্রিয়ার রাজা (KING FRIEDRICH) -কে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে এবং ভবিষ্যতে এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করতে অনুরোধ জানায়। কিন্তু হ্যানিমানের দূর্ভাগ্যক্রমে এই রাজকুমার আরোগ্য লাভের পর পরই পুনরায় তার বদঅভ্যাস আর মাত্রাধিক মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে সে একই বছর পুনরায় অসুস্থ হয় আর এলোপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করে। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ ঘটনার সমস্ত দায়-দায়িত্ব অষ্ট্রিয়ার সরকার হ্যানিমানের উপর চাপিয়ে দেয়। এর ফলে জনসাধারণের মনে তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ানক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় আর বিক্ষোভস্বরূপ বিভিন্ন স্থানে তাঁর রচিত বই-পুস্তক পোড়ানো আরম্ভ হয়। বাধ্য হয়ে হ্যানিমানকে KOTHEN (কোথেন)-এ আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এখানে DUKE OF COTHEN তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হ্যানিমান কোথেন-এ চৌদ্দ বছর অবস্থান করেন আর এ সময় তিনি CRONIC DISEASES বা পুরাতন ব্যাধির উপর গভীর ও দীর্ঘ নিরীক্ষণ ও গবেষণা চালান। এ গবেষণা কর্মের প্রথম খন্ড পুস্তক আকারে ১৮২৮ সনে প্রকাশিত হয়। ১৮৩০ সনে তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয় আর ১৮৩৫ সনে তিনি একজন ফরাসী মহিলার সাথে পনুরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্যারিসে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৮৩৫ থেকে তাঁর মৃত্যু অবধি অর্থাৎ ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সে অবস্থান করে হোমিও প্র্যাক্টিস অব্যাহত রাখেন। ১৮৩৫ইং সন হলো সেই বছর যে বছর আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। (চলবে)

অনুবাদ–মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
মুরব্বী সিলসিলা

প্রফেসার আব্দুল লতিফ

এক বড়ে বুযুর্গ থে

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

প্রফেসার আব্দুল লতিফ

হযরত রসূল করীম (সঃ)এর একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত আছে–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দামেস্কের মসজিদে আকসা সংলগ্ন শ্বেত মিনারের পূর্বদিকে নাযেল হবেন (মুসলিম)। এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার প্রেক্ষিতে আবির্ভূত হুযূর আকদাস (আঃ)-এর নিকট ইলহাম হয়–'আনন্দের সাথে চল। তোমার বিজয়কাল সমুপস্থিত এবং অচিরেই মুহাম্মদীগণের পদদ্বয় মীনারোপরি উচ্চ শিখরে সংস্থাপিত হওয়ার সময় আসন্ন।' ফলে ইলহামের নির্দেশনায় এ রূপক ভবিষ্যদ্বাণীটিকে বাহ্যিকভাবে পূর্ণতাদানের লক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তীর্থস্থান কাদিয়ানের জুমুআ মসজিদটির নামকরণ করেন 'মসজিদে আকসা' এবং উক্ত মসজিদের পূর্ব-উত্তর প্রান্তে একটি শ্বেত মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। ১৯০০ সালে এ পবিত্র প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষে দশ হাজার টাকার প্রাক্কলন ধরা হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ২৮মে ১৯০০ সালে এক ইশতেহার প্রকাশ করেন। তিনি তাহরিক করেন যারা একশত বা ততোধিক টাকা চাঁদা প্রদান করবেন তাদের নাম মিনারের গায়ে খোদাই করে লিখে স্মরণীয় করে রাখা হবে। ফলে আশেকে মসীহেজ্জামানের নিকট থেকে আশাতিরিক্ত সাড়া পাওয়া যায়। হযরত উম্মুল মোমেনীন (রাঃ) তাঁর পৈত্রিক বাড়ী বিক্রী করে এক হাজার টাকা চাঁদা প্রদান করেন। তখন ১০১ জন একশত বা ততোধিক টাকা প্রদান করেছিলেন। ফলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক ১৯০০ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কিন্তু হুযূর আকদাস (আঃ)-এর জীবদ্দশায় এর নির্মাণ শেষ হয়নি। মাত্র ক'টি সিড়ির ধাপ নির্মিত হয়েছিল। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১৯১৬ সালে এর অসম্পূর্ণ নির্মাণ সমাপ্তির কাজ শুরু করেন। তখন নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধির কারণে হুযূর (রাঃ) পুনরায় চাঁদার তাহরিক করলে জামাতে আহমদীয়ার অনেক নিষ্ঠাবান দানবীর পরিমিত চাঁদা প্রদান করেন। ফলে ১৯২৩ সালে এ ঐতিহাসিক মিনার নির্মাণের কাজ যথার্থভাবে সম্পন্ন হয়। সর্বমোট ২৯৮ জন মসীহের আশেক একশত বা ততোধিক টাকার চাঁদা প্রদান করেন। তন্মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী বাংলার গৌরব আমাদের প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেব। ফলে শ্বেত মিনারের গায়ে শ্বেত মার্বেল পাথরে ক্ষুদিত করে লেখা ২৯৮ জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির নামের মাঝে আব্দুল লতিফ সাহেবের নামটি ঝলমল করে প্রজ্জ্বলিত হয়ে রয়েছে। এবং হাজার বছর ধরে অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তা আলোকোজ্জল জ্যোতিতে অম্লান হয়ে থাকবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভাষায়–মসীহ্ মাওউদের সত্যিকার আগমন ও তাঁর হেদায়াতের আলো বিশ্বব্যাপী বিকিরণ এ উচ্চ মিনারের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ হওয়ার উপরই নির্ভরশীল। সুতরাং পূর্ব থেকেই এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, মসীহ্ মাওউদের সময় মানব হৃদয়ে যে আলো ও ইয়াকীন (বিশ্বস্ততা) সৃষ্টি হওয়ার কথা রয়েছে তা এ মিনার নির্মাণের পরই পরিলক্ষিত হবে (ইশতেহার ১ জুলাই ১৯০৭ খ্রীঃ)। হযরত আহমদ (আঃ) আরো বলেন, যে খোদা এ উচ্চ মিনার প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছেন তা এ দিকেই ইঙ্গিত করছে যে, ইসলামের মধ্যে বর্তমানে যে মৃতবৎ অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে তা এ মিনার তৈরীর পর থেকেই দূরীভূত হবে এবং মানব হৃদয়ে নবজাগরণের স্ফুলিঙ্গ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এবং এটি একটি বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ হবে। (তবলীগে রিসালতঃ ৬ষ্ঠ খন্ড ১৭৮ পৃষ্ঠা)। ফলে আহমদীয়াতের বিজয় গাঁথা কাহিনীতে এ মিনার নির্মাণের একজন সৌভাগ্যবান অংশীদার হিসেবে প্রফেসার আব্দুল লতিফ সাহেবের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

পবিত্র চিত্তের মানুষ আব্দুল লতিফ সাহেবের সারাটা জীবন ছিল পুণ্যাত্মার মাঝে ভরপুর। বিভিন্ন অধ্যায়ে তাঁর জীবন পরহেজগারী ও তাক্ওয়াপরায়ণতার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। এ প্রসঙ্গে ডাঃ মির্যা আলী আখন্দ তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় বলেন–তখন তিনি এ দেশের প্রাদেশিক আমীর। রংপুরের গাইবান্ধার মৌলভী আব্দুস সোবহান সাহেব পার্বতীপুরের রেলওয়ের পুলিশ অফিসার। হযরত প্রফেসার সাহেব জলপাইগুড়ির অন্তর্ভূক্ত বেলাকুবায় জলসায় যোগদান করার জন্য যাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে মৌলভী আব্দুস সোবহান সাহেব পার্বতীপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। তাঁর চেহারা দেখে তাকে খুব চিন্তান্বিত ও অস্থির বোধ হচ্ছিল। মৌলভী আব্দুস সোবহান সাহেব তাঁকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, পূর্ববর্তী ষ্টেশনে এক ভেন্ডারের নিকট হতে তিনি লেমনেড খেয়েছেন, কিন্তু গাড়ি ছেড়ে দেয়ায় তিনি দাম দিতে পারেন নাই। সেজন্য অত্যন্ত

অস্থিরতা বোধ করছেন। মৌলভী আব্দুস সোবহান সাহেব হেসে বললেন, 'আমি পুলিশ অফিসার, একজন পুলিশ পাঠিয়ে তার দাম দিয়ে দিব। আপনি বিশ্রাম করুন।' তিনি বললেন সেখানে ভেন্ডার তো একজন নয় অনেক, আমি কোন ভেন্ডারের নিকট থেকে লেমনেড খেয়েছি সে কেমন করে চিনবে?' আমি নিজেই যাবো, অতঃপর তিনি পরবর্তী গাড়িতে নিজে গিয়ে ভেন্ডারকে দাম দিয়ে শান্তি লাভ করলেন।

একবার তাঁর বাড়ীর সম্মুখস্ত কাতালগঞ্জ রোড দিয়ে এক ব্যক্তি কচুর বড় বোঝা নিয়ে বিক্রীর জন্য বাজারে যাচ্ছিল। তিনি দেখলেন বোঝাটি তার শক্তির বাইরে ও বোঝার চাপে সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। যদিও তাঁর কচু কিনার কোন দরকার ছিল না তবু তিনি তাকে ডেকে বোঝা নামালেন ও তার নিকট হতে অনেকগুলি কচু খরিদ করে নিলেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন তার বোঝা অনেক হালকা হয়েছে তখন তিনি তাকে বোঝা উঠিয়ে বিদায় দিলেন আর সে খুব খুশী হয়ে তাঁকে দোয়া করতে করতে চলে গেল। নিকটবর্তী এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন হুযূর আপনার তো এত কচুর দরকার নেই তবে এতগুলো কচু কি জন্য খরিদ করলেন?" উত্তরে তিনি বললেন, 'দেখ, ঐ ব্যক্তি পেটের দায়ে তাঁর শক্তির অতিরিক্ত বোঝা নিয়ে যাচ্ছিল, এতে তার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। সেজন্য এ কচুগুলো কিনে তার বোঝা হালকা করে দিলাম, দেখ এখন সে কত আরামে ও খুশীর সাথে যাচ্ছে।

আব্দুল লতিফ সাহেবের হৃদয় ঐশী করুণায় ভরপুর ছিল। দুস্থ মানুষের দুঃখ বেদনা দেখলে তিনি অভিভূত হয়ে যেতেন। একবার এক চোর রাতের অন্ধকারে তাঁর এক কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল চুরি করতে উঠে। নিকটে এক ঘরে দুই জন আহমদী যুবক বাস করতেন। তারা কাঁঠাল পরার শব্দ শুনে দৌড়ে গিয়ে চোরকে ঘিরে ধরেন ও হযরত মৌলভী আব্দুল লতিফ (রহঃ) সাহেবকে চোর ধরেছি' বলে তার ঘর হতে ডেকে নিয়ে আসেন। চোর তখনও গাছের উপরে। মৌলভী সাহেবকে দেখে চোর হাত জোর করে বলল, 'হুযূর' আমরা গরীব মানুষ; কাঁঠাল কিনে খেতে পারি না। ছেলেপিলেকে খাওয়ানোর জন্য চুরি করতে এসেছি।" তার কথা শুনে তিনি অভিভুত হয়ে পড়লেন ও তাদেরকে বললেন, "তোমরা তাকে কিছু বলিও না। কিছু বললে সে গাছ হতে পড়ে ব্যথা পেতে পারে।' চোর নীচে নেমে আসলে তিনি তাকে সবগুলো কাঁঠাল দিয়ে দিলেন, আর বললেন, "চুরি করা অন্যায়। তুমি কাঁঠাল চাইলেতো পেতে'। চুরি করলে কেন; ভবিষ্যতে আর চুরি করিও না।" উক্ত দু'জন আহমদীর মধ্যে একজন ডিষ্ট্রিক্ট ফিজিকেল অরগানাইজার মৌলভী জিন্নত আলী ভুইয়া। তিনি তখন চট্টগ্রামে গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলের ছাত্র।

কাতালগঞ্জ রোডের পার্শ্বে তিনি একটা খুব সুন্দর টিনের ঘর তৈরী করেছিলেন। সে সময় তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধিতা খুব চরম সীমায় উঠে। শত্রুরা তাঁর সে সুন্দর ঘরটি পুড়ে ফেলে। ক'জন গয়ের আহমদী প্রতিবেশী তাঁকে বলল, "হুযূর যারা আগুন লাগিয়েছে তাদেরকে আমরা চিনি, 'তাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেন আমরা সাক্ষ্য দিব। কিন্তু তিনি এতে রাজী হলেন না। এর পরিবর্তে তিনি এ পোড়া ঘরের উপরে অর্ধপোড়া থামে মাটির সরার মধ্যে একটি প্রার্থনা লিখে লটকায়ে দিলেন। এ প্রার্থনার মর্ম ছিল, ঘর আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করে বলছে, "হে আল্লাহ্ আমার চেহারা অতি সুন্দর ছিল, আমার মধ্যে বহু লোক আশ্রয় নিত, আমার চেহারা আবার সুন্দর করে দাও।" শত্রুরা মনে করল এটা বুঝি তাদের বিরুদ্ধে কোন দোয়া। তাই এটাও তারা চুরি করে নিয়ে গেল। এরপরে এ জায়গায় একটি সুন্দর দালান হল। প্রফেসার সাহেব নিজেই মীর হাবীব আলীর নিকট কয়েকবার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন-"আমার হাতে কোন টাকা পয়সা ছিল না এবং এখানে দালান করারও আমার কোন দিন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু শুধু আল্লাহ্‌র খাস রহমত ও মহিমায় এখানে দালান হয়েছে।" দুশমনদের মধ্যে পরে একজন কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। এ লোকটি রোগের অবস্থায় পোলাও খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রফেসার সাহেব তার ইচ্ছার কথা শুনে নিজের বাসাতে পোলাও কোরমা রান্না করে তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। এরূপ ব্যবহার শুধু ওলীআল্লাহ্‌দের পক্ষেই সম্ভব। (পাক্ষিক আহমদী ১৫ এপ্রিল ১৯৬৫ সংখ্যা)।

প্রফেসার সাহেবের দাম্পত্য জীবনের যৌবনকালে বহু সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু তারা জন্ম লগ্নেই মারা যায়। ঐশী জামাতে দীক্ষা গ্রহণের পর ১৯২০ সালে তাঁর এক পুত্র সন্ত ান হয়। যেহেতু তাঁর সন্তান বাঁচে না তাই দাদী এ আদরের দুলালের ডাক নাম রাখেন ফালুমিয়া। যেন সন্তানটি দীর্ঘজীবি হয়। তখন পিতা স্বপ্নে তাঁর নাম গোলাম আহমদ রাখার ইঙ্গিত পান। তাই আখেরী ইমামুজ্জামান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নামে নাম রাখেন গোলাম আহমদ। বংশ পরম্পরায় গোলাম আহমদ খান। আবার বনেদী ও প্রফেসার সাহেবের সন্তান হিসেবে অনেকে তাঁকে সম্মানসূচক 'বড় মিয়া' বলেও ডাকতেন। পরে লতিফ সাহেবের দুটি কন্যা সন্তানেরও জন্ম হয়। তারা হলেন-মাহমুদা বেগম ও মোহসেনা বেগম। তারা তিনজনই দীর্ঘজীবন লাভ করেছেন। এবং ধর্মের নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। মাতাপিতা তাদেরকে যে ধর্মীয় তালীম তরবীয়ত প্রদান করেন তা-ই তাদের জীবনে পাথেয় ছিল। উত্তম উত্তরাধিকারী আদর্শ সন্তান হিসেবে তারা প্রতিষ্ঠিত হন। এমনকি নিজ সন্তানদেরকেও তারা পিতা হতে প্রাপ্ত শিক্ষায় ধর্মপরায়ণ সন্তান হিসেবে গড়ে তুলেছেন। মাতাপিতার আদর্শগত শিক্ষায় পিতার নির্মিত মসজিদের ভূমি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নামে রেজিষ্ট্রীমূলে ওয়াক্‌ফ করে দেন। উন্নয়নের ছোঁয়ায় বর্তমানে এ ভূমিতে 'মসজিদে বাসেত' নির্মিত হয়েছে। চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কর্মকান্ড এখানেই প্রতিষ্ঠিত। (চলবে)

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

আসুন আমরা জেনে নেই

ওয়াক্‌ফে জাদীদ কি এবং কেন?

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে একটি বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর সুন্নত (আদর্শ) প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুগ ইমাম মুজাদ্দিদে আযম হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সুদূর প্রসারী জামাতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রূহানী জামাতের আধ্যাত্মিক নেতা যুগ খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল-মুসলেহ মাওউদ (রাযিঃ) ওয়াক্‌ফে জাদীদের স্কীম চালু করেন। উক্ত স্কীমের অর্থাৎ ওয়াক্‌ফে জাদীদের অধীনে পবিত্র, কুরআনের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বেশি বেশি মোয়াল্লেম তৈরী করা, যাতে জামাতের মধ্যে কুরআনের শিক্ষাদানের বাধা না পড়ে, এবং এহেন পবিত্র কাজে ব্যাঘাত না ঘটে। এর জন্য বেশি বেশি মালী কুরবানীর একান্ত আবশ্যক।

আসুন আমরা জেনে নেই

যেহেতু রূহানী বা ঐশী জামাতের ইমাম (নেতা) দূর দৃষ্টিসম্পন্ন একজন মানুষ হিসেবে জনকল্যাণকর কাজের পাশাপাশি তালীমুল কুরআন এর (কুরআন শিক্ষার) বিষয়টি এককভাবে জামাতের সামনে উপস্থিত করতে উদ্বুদ্ধ হন। কেননা, পবিত্র কুরআন ব্যতিরেকে মানব জাতির কখনো নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক উন্নতি হতে পারে না। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রসঙ্গে জনৈক কবি বলেন–

আল-কুরআনের শিক্ষা লয়ে
চলবে যে কেউ মুসলমান
বাড়বে ঈমান–বাড়বে জ্ঞান।
আল-কুরআনের শিক্ষা যদি
থাকে কারো অন্তরে
এমন কর্ম করবে না সে
যা না কি' তার
–জীবনটাকে নাশ করে।

অতএব মনে রাখতে হবে, যে যত জ্ঞান অর্জন করুক না কেন, কিন্তু পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র বানীর জ্ঞান অর্জন না করা পর্যন্ত প্রকৃত জ্ঞানী হতে পারে না। কুরআনের জ্ঞানই আসল জ্ঞান।

ওয়াক্‌ফে জাদীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উল্লেখ্য যে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলীফা হযররত মুসলে মাওউদ (রাযিঃ)-এর শেষ তাহরীক বা আহবান ওয়াক্‌ফে জাদীদ-এর বিভাগ চালু করা। ২০০৬ইং তারিখের ১৫ মে সংখ্যায় প্রকাশিত পাক্ষিক আহমদীতে বলা হয়েছে যে, ওয়াক্‌ফে জাদীদ একটি আসমানী তাহরীক বা আন্দোলন। সত্যিই বলা হয়েছে। এ আলোচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, জামাতের মধ্যে তালীম তরবীয়ত ও তাক্‌ওয়া তাহারাতের শিক্ষাদানের পর তবলীগ করা। তবে তাক্‌ওয়া তাহারাত অর্জন করতে হলে কুরআনের শিক্ষা অর্জন করা ফরয। পবিত্র হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, খায়রুকুম-মান্‌তা আল্লামাল্ কুরআনা ওয়াল্লামাহু অর্থঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে ব্যক্তি কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। বস্তুত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা আহমদ (আঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ও ছিল যে দুনিয়ার মানুষকে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযেলকৃত আল্লাহ্‌র বাণী (আল-কুরআন) অনুসরণ করে তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। অতএব–এ আধ্যাত্মিক সিলসিলার মনোনীত খলীফার মাধ্যমে সেই যুগ ইমাম হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে, ওয়াক্‌ফে জাদীদ-এর স্কীম চালু করে আর্থিক কুরবানী করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। তাই আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আইঃ) জানুয়ারী ২০০৬ইং তারিখে কাদিয়ানের বায়তুল আমানে প্রদত্ত খুতবায় ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৪০তম নববর্ষের ঘোষণায় বলেন, শিশু এবং নওমোবাঈনদেরকে (নবদীক্ষিতদেরকে) ওয়াক্‌ফে জাদীদে শামিল করুন। এর পূর্বে তাশাহুদ তা'উয তাসমিয়া ও সূরা ফতেহা পাঠের পর হুযূর সূরা সাফ্‌ফ এর ১১ নং আয়াত থেকে ১৩ নং আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করে খুতবা প্রদান করেন।

যার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

হে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ (পরিশ্রম) কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণজনক যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।

(ফলে) তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে এবং পবিত্র ও মনোরম আবাসমূহ চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহের মধ্যে, এটাই পরম সাফল্য। বর্ণিত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাঁর পথে নিজ ধন-সম্পদ খরচ করলে ক্ষমা করবেন এবং সফলতা দান করবেন। অতঃপর হুযূর বলেন, আমরা আল্লাহ্‌তাআলার অগণিত ফযলের যে দৃশ্য দেখছি, আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগামীতে আরো বেশি যেন দেখতে পাই। হুযূর বলেন,

আমরা যদি খাঁটি অন্তরে আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং করতে থাকি, তাঁর আদেশ পালনের চেষ্টা করতে থাকি, এবং পুণ্য কর্ম করে যাই, আর নিজেদের সম্পদ (অর্থ) তাঁর ধর্মের জন্য খরচ করতে থাকি, তাহলে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এক বা দুই কিংবা তিন বছরের কথা নয় বরং এসব কাজ যদি করতে থাকি তাহলে আমরা চিরদিনের জন্য তাঁর নৈকট্য লাভ করব। প্রত্যেক

বছরই আমাদের থলি বরকতে ভরে দিয়ে যাবে। তাছাড়া এসব পুণ্য কর্ম ইহজগতেও পরকালে আমাদেরকে পুরস্কৃত করবে।
প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের জুমুআর খুতবায় ওয়াক্‌ফে জাদীদের নববর্ষ ঘোষণা দেয়া হয়ে থাকে। এর সাথে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় বা মালী কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্-খামেস (আইঃ) বলেন, যে পরিমাণ অর্থ কুরবানী করা হয়েছে তার রিপোর্ট দিয়ে নতুন বছরের ঘোষণা দিব।
নিজ নফস্ বা আত্মশুদ্ধির জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র পথে মালী কুরবানী করা একান্ত আবশ্যক।

ওয়াক্‌ফে জাদীদের দু'টি দিক

এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে কথায় বলে–
দশের লাঠি একের বোঝা
অর্থ যোগান খুবই সোজা।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, ওয়াক্‌ফে জাদীদের দু'টি দিকের মধ্যে একটি দিক হচ্ছে নিজ সন্তানদেরকে প্রথমে ঘরোয়া পরিবেশে তালীম তরবীয়ত দিয়ে উপযোগী করে ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী (উৎসর্গ করার) জন্য সংকল্প গ্রহণ করা।
তবে হ্যা, তালীম তরবীয়তের এবং কুরআনের শিক্ষাদানের লক্ষ্যে প্রত্যেক জামাতে কমপক্ষে একজন যোগ্য মোয়াল্লেম থাকা আবশ্যক। তা না হলে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দিবে কে বা কারা?
তাই ওয়াক্‌ফে জাদীদের অধীনে প্রথম মোয়াল্লেম ওয়াক্‌ফে জাদীদ বানাবার লক্ষ্যে সন্তানদেরকে প্রথম ওয়াক্‌ফ (উৎসর্গ) করে আর্থিক কুরবানী দ্বারা সহযোগিতা করা প্রত্যেক আহমদীর জন্য একান্ত আবশ্যক।
দ্বিতীয় দিক হচ্ছে আর্থিক কুরবানী পেশ করা।
ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে,
দশের লাঠি একের বোঝা
অর্থ যোগান খুবই সোজা।
কেননা, এক ব্যক্তির এক টাকা তার নিকট খুবই সামান্য। তবে এক হাজার কিম্বা এক লাখ মানুষের এক টাকা যদি একত্র হয়, তাহলে হাজার বা লাখ টাকা সংখ্যা দাঁড়ায়। সুতরাং মহান আল্লাহ্‌র বাণী ও তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ করে এবং যুগ ইমামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেশি বেশি সংখ্যায় ওয়াক্‌ফে জাদীদে অংশগ্রহণ করে ওয়াদা লিখিয়ে সময় মত পরিশোধ করে দিলে আল্লাহ্‌র ফযলে ওয়াক্‌ফে জাদীদের কার্যক্রম অতি সহজ হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। উক্ত খাতে যত বেশি অর্থ দান করা হবে, তত, বেশি মোয়াল্লেম তৈরীর কাজে সহায়ক হবে। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। ১৯৮৯ সনে 'শতবার্ষিকী' জুবিলী ও সালানা জলসায় (তারুয়াতে) মোবারকবাদ নামের একটি পঠিত নযমে উপস্থিত করা হয়েছিল যে,
আমরা আহমদী আমরা ভাই ভাই
আমাদের মাঝে নাই কোলাহল
নাই কোন কোন্দল
দুঃখ যাতনায় হারাইনা মনোবল,
আমাদের মাঝে খলীফা বিদ্যমান
সকলেই শান্তি তার ফরমান–
কেননা আমরা মুসলমান।
উল্লিখিত নযমে খলীফার ফরমান মান্য করার কথা বলা হয়েছে। অতএব যুগ খলীফার প্রতিনিধি ন্যাশনাল আমীরের আহ্বানে সাড়া দেয়া অর্থাৎ তাঁর ডাকে ধর্ম কর্মে এগিয়ে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কবির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়।
মান্য যদি নাইবা করি
যুগ ইমামের ফরমান
হয়ে আমরা মুসলমান
কতনা কঠিন হবে মোদের
রোজ হাশরের ময়দান
চলুন এখন আমরা দেখি
মহান আল্লাহ্ বলেন কি?
লান তানালুল বিররা হাত্তা তুনফেকু মিম্মা তুহেবুবুন– অর্থাৎ তোমরা কখনো পূণ্য বা কল্যাণ অর্জন করতে পার না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর। (সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত ঃ৯৩)
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে সত্যিকার বিশ্বাস, যা সকল মঙ্গলের আকর ও সকল পুণ্যের বা পুণ্য কর্মের উৎস তা অর্জন করতে হলে ঈমানদারগণের (আহমদীদের) প্রিয়তম বস্তুকে উৎসর্গ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। সর্বোচ্চস্তরের বিশ্বাস ও ধর্ম পরায়ণতা লাভের জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় ভালবাসার বস্তুকে বিলিয়ে দিতে হবে। সত্যিকার কুরবানীর চেতনা হৃদয়ে না থাকলে, নৈতিকতার উচ্চ শিখড়ে আরোহণ করা যায় না। সুতরাং আমরা যারা আহমদী আমরা প্রত্যেকেই কামনা করি যে, দিন দিন জামাত বৃদ্ধি হোক এবং প্রত্যেক জামাতে কমপক্ষে একজন যোগ্য মোয়াল্লেম ওয়াক্‌ফে জাদীদ থাকা আবশ্যক। এমন কামনা অবশ্যই ভাল। কিন্তু জামাতের চাহিদানুযায়ী আমরা মোয়াল্লেম আর কোথায় এবং কিরূপে? অনেকেই তো ন্যাশনাল আমীরের নিকট আমরা দরখাস্ত করে থাকি আমাদের জামাতে একজন মোয়াল্লেম আবশ্যক। অতি তাড়াতাড়ি একজন মোয়াল্লেম পাঠালে খুবই ভাল হয়। এরূপ দরখাস্ত আশা তো খুবই খুশীর কথা–তবে আমরা যদি ওয়াক্‌ফে জাদীদের প্রয়োজন উপলব্ধি করে প্রত্যেক জামাতে সর্বস্তরের (শিশুসহ) আহমদীদের ওয়াক্‌ফে জাদীদে ওয়াদা লিখিয়ে তা সময়মত পরিশোধ করে দেই, তাহলে অবশ্য আশা করা যায় যে ন্যাশনাল আমীর সাহেব ওয়াক্‌ফে জাদীদের অধীনে যত বেশি সংখ্যার মোয়াল্লেমের প্রয়োজন, তা তিনি দিতে সক্ষম হবেন। তা না করে যদি আমরা শুধু শুধু মোয়াল্লেম দাবী করতে থাকি, তা হলে তো তিনি ও আমাদের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতিতে অবস্থান করবেন। যুগ খলীফার প্রতিনিধিকে বিব্রতকর অবস্থায় রাখা আমাদের জন্য কত অকল্যাণকর হতে পারে তা আমাদেরকেই বিবেচনা করতে হবে। এমন হিতকর দায়িত্বের অংশ আমাদের প্রত্যেকেরই গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।
অতএব আমাদের উচিত হবে আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যুগ ইমামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজ নিজ সামর্থনুযায়ী দোয়া দরূদ ও ইস্তেগফার করার মাধ্যমে ভাল (নেক) সংকল্প লয়ে জামাতের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করা, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাঁদার পাশাপাশি ওয়াক্‌ফে জাদীদেও অংশগ্রহণ করে যেন সৌভাগ্যশালী হওয়ার সুযোগ অর্জন করি। আল্লাহ্ করুন আমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ সদা সদয় থাকেন যাতে করে আমরা যেন বেশি বেশি মালী কুরবানী করে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হই।

পরিশেষে এ বিষয়ে সকলের নিকট
দোয়া চাই দোয়া করি
দোয়াই হবে মহাতরী।

ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ

অসুস্থ দুর্নীতি

মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই নীতি ও দুর্নীতি চলমান, আর আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের মাঝেই বিদ্যমান এ দুর্নীতি। তদ্ব্যতীত অন্য আর কোন প্রানীই তার জীবন যাপনের জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নেয় না। তাই এক টিভি উপস্থাপক বলেছেন, "গরু খাঁটি দুধ দেয়, আর গোয়ালা পানি মিশ্রিত ঐ দুধ বিক্রি করে। সুতরাং দুগ্ধদাতা গরু গোয়ালা নামক সেই মানুষটির চেয়ে খারাপ কোন অংশে?

মূলতঃ প্রতিটি মানুষেরই নীতির প্রতি প্রীতি আর দুর্নীতির প্রতি ভীতি আছে, যা স্বভাবিক কথা যদি তাই হয় তবে জগৎ আজ দুর্নীতিতে সয়লাব কেন? তা এ কারণেই যে, আজকালকার দুর্নীতির রূপ বড়ই ভয়ঙ্কর এবং দুর্নীতি করা বড়ই সোজা, যেমন পুলিশও এখন ছিনতাই করে। পূর্বে একজন ভোট প্রার্থী কিছু অবৈধ ভোট নিয়ে প্রতিপক্ষকে হারাবার চেষ্টা করত, কিন্তু এখন সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে নির্জনে আটকিয়ে তার স্বজনদের নিকট হতে কিছু মুক্তিপন আদায় করতঃ তাকে খুন করে গহীন জঙ্গলে মাটি চাপা দিয়ে পুঁতে রাখে। আট টাকা দেনা পাওনার জন্য সৃষ্ট ঝগড়ার ঈর্ষা মিটাতে গিয়ে আট বছরের নিরপরাধ শিশুটিকে আটটি টুকরা করে আট জায়গায় মাটিতে চাপা দিয়ে রাখে। গৃহকর্তার ২৫ বছরের ছেলেটি ভাড়াটিয়ার ৫বছরের মেয়েটিকে ধর্ষণ করে গলা টিপে মেরে মাথাটিকে কাঁদায় পুঁতে পা দুটাকে কচুরীপানা দ্বারা ঢেকে রাখে। ক্ষমতার বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে কোন এক রাষ্ট্রনায়ক অন্য একটি দেশকে দখল করে সে দেশের জনগণকে খুন করে তাদের সুন্দর সম্পদকে লুটে নারীদের শ্লীলতাহানী করে তার ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। এসব অপকর্মকে কেবল দুর্নীতিই বলা যায় না বরং এসবকে বলা যায় অসুস্থ দুর্নীতি, যা মানুষের দ্বারা সাধিত হচ্ছে তবে তা কল্পনাতীত। তা হলে প্রশ্ন আসে এসব হচ্ছে কেন? উত্তর হলো নিজের দ্বারা সাধিত দুর্নীতিকে কেউ নিজে সনাক্ত করেন না। পরন্তু অন্যের দ্বারা কৃত দুর্নীতিকে বেশ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন, ডাক্তার বাবু রোগীকে সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা না দিয়ে তিনি তাকে কেন তার প্রাইভেট ক্লিনিকে গিয়ে চিকিৎসা করানোর ইঙ্গিত করেন সেজন্য স্কুল শিক্ষক সাহেব বিষন্ন মনে রাগ করেন। অন্যদিকে শিক্ষক মহাশয় কেন ডাক্তার বাবুর ছেলেকে স্কুলে সুষ্ঠ পাঠদান না করে তার প্রাইভেট স্কুলে গিয়ে পড়ার ইঙ্গিত করেন তজ্জন্য ডাক্তার বাবুও ভীষনভাবে ক্ষুব্ধ হন, এখানে উভয়েই উভয়ের কাজকে দুর্নীতির কাজ বলে মনে করেন। অথচ নিজে নিজেকে পর্যালোচনা করেন না। "আসলে ঐ তিনিই কেবল দুর্নীতিবাজ, আমি নই।" তাই দুর্নীতি আজ এ ফরমূলার সুযোগ পেয়ে তার চলার পথে বেশ আনায়াসেই এগিয়ে চলছে, এবং এর ভয়াবহতা বারবারই বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এ দুর্নীতি যেসকল সেক্টরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ধর্ম জগত। দুর্নীতির চাকায় যদি ধর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায় তবে অন্য সব ক্ষেত্রে দুর্নীতির কাজটা একটু সহজতর হয়। মূলতঃ এ হলো দুর্নীতিবাজদের কল্প পরিকল্পনা, অর্থাৎ যদি গৃহের আলোকে নিভিয়ে দেয়া যায় তবে ঐ গৃহভ্যান্তরে ঢুকে চুরি করার কাজটা একটু সহজতর হয় বৈ কি? এক্ষেত্রে দুর্নীতিগুলো হলো নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) মারা গিয়েছেন, এ কথা স্বীকার করে নিয়েও হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ)কে গত ২ হাজার বৎসর যাবত সশরীরে চৌথা আসমানে জীবিত বসিয়ে রাখা, ইসলামে নবী আগমনের দ্বারকে রুদ্ধ করে রাখা মানে হল খোদার পক্ষ থেকে ওহী ইলহাম আসার পথকে বন্ধ করে দেয়া ইত্যাদি। ইত্যকার উদ্ভট সিদ্ধান্ত সমূহকে কেবল ইসলামই নয় অন্য সব ধর্মমতের সত্য শিক্ষাগুলিও কিন্তু ভ্রান্ত বলে মনে করে। সুতরাং এসবের প্রত্যেকটাই হলো ধর্মের নামে দুর্নীতি, যা ধর্মের বিকৃত অনুসারীগণ পূর্বেও করেছে, এখনও করে আসছে। অন্যদিকে কোন কোন অতিভক্ত তারা নিজ ধর্মের মধ্যে অথবা কোন কোন কম ভক্ত অন্য ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঐ ধর্মের মূল বিশ্বাসের ওপর কলংকময় দুর্নীতির বীজ প্রক্ষিপ্ত করেছে। যেমন কোন এক অতিভক্ত বলেছেন (সংক্ষিপ্তাকারে) "সাইয়্যেদুল মুরসালীন হুযূর পাক (সঃ) এর শরীর মোবারকের মাথার চুল মোবারক থেকে শুরু করে পায়ের তালু মোবাবরক পর্যন্ত এমন কোন ছিলনা যেটা ফেলে দেয়ার মত, যা নাপাক বা অপছন্দনীয়। যেমন কোন একদিন এক গামলায় হুযূর পাক (সঃ)-এর পেশাব মোবারক ছিল, তিনি অসুস্থ থাকার কারণে বাইরে যেতে পারছিলেন না বিধায় ঐ গামলাতেই এস্তেঞ্জা করেন, প্রত্যুষে তিনি (সঃ) তাঁর এক সাহাবী (রাঃ)কে (সাহাবীর

নাম নেই) এ গামলা ভরা এস্তেঞ্জা দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসতে বলেন এবং তার ওপর দিয়ে কেউ যেন হাঁটাহাঁটি কিংবা না মাড়ায় তার জন্য তিনি তাকে নিষেধ করে দেন। যদি কেউ এ নির্দেশের ব্যতিক্রম করে তবে তার ঈমানের ঘাটতি হবে এবং সমূহ ক্ষতির কারণ হবে। ঐ সাহাবী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনি সেই গামলা নিয়ে নির্জনে চলে যান, এবং ঐ গামলার পেশাব পান করে ফেলেন। অতঃপর ঐ সাহাবী (রাঃ) ফিরে আসলে পর কথার ফাঁকে যখন তাঁর মুখ থেকে সুঘ্রাণ বেরিয়ে আসতেছিল তখন রসূলে পাক (সঃ) বুঝলেন যে, ঐ সাহাবী (রাঃ) তাঁর এস্তেঞ্জাকে পান করে ফেলেছেন। সাহাবী (রাঃ) কে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি তাঁর সত্যতা স্বীকার করলেন। তখন হুযূর পাক (সঃ) বললেন, "তোমার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে গেল"। এ উক্তির প্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে লেখক কোন হাদীসের রেফারেন্সে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন? দ্বিতীয় হলো, আত্মার পবিত্রতা বিনে কেবলমাত্র রসূলে পাক (সঃ)-এর এস্তেঞ্জা পানেই যদি জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়, তবে নবুওয়ত প্রাপ্তির পর ২৩টি বছর কেন তিনি (সঃ) তাঁর প্রস্রাব সাহাবা কেরামাদের না খাইয়ে তিনি জমিনে পেশাব করলেন? তিনি (সঃ) তো কেবল তাঁর পেশাব না করিয়েই শত শত অনুসারীকে জান্নাতবাসী করতে পারতেন? তৃতীয়তঃ রসুলে করীম (সঃ) কি খোদার পক্ষ থেকে এমন কেন অনুমতি পেয়েছেন যে তিনি এমনিভাবে তাঁকে অনুসারীকে জান্নাতবাসী করবেন? যদি তা-ই হতো তবে তাঁর (সঃ)-এর চার খলীফার প্রত্যেকে এবং (সঃ)-এর পরিবারে সকলেই তো এ শুভ (!) কর্মের ভাগিদার হতেন! হাদীসমুলে এমন কোন সূত্রের সন্ধান মিলে কি? তাছাড়া প্রায়ই রসুলে পাক (সঃ) এর নিকট এসে কোন কোন সাহাবা জান্নাত প্রাপ্তির পথ সন্ধানের উপদেশ চাইতেন। তিনি এক্ষেত্রে প্রত্যাশিদের বিবিধ পুণ্যকর্ম করার উপদেশ দিতেন (হাদীসমতে) কখনও তো তাঁকে এ কথা বলতে শুনিনি যে তোমরা এর জন্য পেশাব সেবন কর! (নাউযুবিল্লাহ্)। একেই বলে অতিভক্তের আহম্মক মার্কা দুর্নীতি। (সূত্র ঃ মুহাম্মদীয়া জামিয়া শরীফের মুখপত্র মাসিক আল বাইয়্যিনাত ১ম বর্ষ ৩য় সখ্যা সেপ্টেম্বর/১৯ এর ৩-৪ নং পৃঃ)

এবার আসুন সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সেই তৌহিদবাদী রসূলে পাক (সঃ)-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ এক কমভক্ত ব্যক্তির একটি উদ্ধৃতি পাঠ করি, এটা মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ রচিত "মোস্তফা চরিত" পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণের ১৩শ পরিচ্ছদ হতে চয়নকৃত। মুহাম্মদ (সঃ) নিজেকে হযরত মুসা (আঃ) হতে বড় নবী হিসেবে প্রচার করার নিমিত্তে কিছু বুদ্ধি আঁটেন, এজন্য পানিতে ভরা কয়েকটি পাত্র তিনি মাটির নীচে লুকিয়ে রাখেন। কয়েকটি শুকর ঐ স্থানের মাটি খুঁড়ে ফেলায় তার দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হয়ে যায়। এতে তিনি ক্রুধান্ধ হয়ে শুকরকে অপবিত্র ও এর মাংস খাওয়াকে হারাম ঘোষণা করেন। এ হলো রসূলে পাক (সঃ)-এর আরেক অভক্ত মস্তিষ্কের রচনাংশ।

রসুলে পাক (সঃ) তো মুসা (আঃ)-এর চেয়ে শুধু বড় নন বরং তিনি তো হলেন খাতামান্নবীঈন' ধর্মজগতের শ্রেষ্ঠ রসূল, আর শুকর খাওয়াকে তিনি হারাম করতে যাবেন কেন? বরং স্বর্গীয় গ্রন্থ আল-কুরআন যে যে দ্রব্যকে হারাম করতে বলেছেন তিনি তো কেবল সে সে বস্তুকেই হারাম জানতে এবং তাঁর অনুসারীদেরকেও এ ব্যাপারে নির্দেশ দিতেন, এতদ্ব্যতীত তিনি তো আর একটি কথাও তাঁর পক্ষ থেকে বলেননি। সুতরাং এহেন যুক্তিহীন অলীক কাহিনী উপস্থাপন করা কুৎসিৎ চরিত্রেরই বহিপ্রকাশ মাত্র। তবে আমাদের সাধারণ মুসলমানগণ কর্তৃক যদি 'খাতামান্নাবীঈন" শব্দের 'শেষ" না করে সঠিক অর্থ "সর্বশ্রেষ্ঠ" করতেন তবে নিশ্চয় এ দুশ্চরিত্র ব্যক্তি এমন ধরণের নোংরা উক্তি করতে সাহস পেতেন না। এ ধরণের ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে ইসলামের শত্রুগণের দ্বারা ইসলাম আক্রান্ত হচ্ছে। তাছাড়া ইহুদী জনগোষ্ঠী কর্তৃক হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ) ক্রুশে ঝুলানো মুর্তি পূজকগণ কর্তৃক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে আগুণে নিক্ষেপণ (আল-কুরআন) এর পত্যেকটাই সৎপথ ভ্রষ্ট আত্মাগণের নীতি ভ্রষ্ট কর্ম।

এ দুর্নীতি দেশ, সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মনীতি ব্যক্তি ও পরিবারকে যে কীভাবে কলংকিত করেছে তার বিশদ যদি আমি লিখতে যাই, তবে আমার কলমের কালি ফুরিয়ে যাবে আর পাঠকগণও পাঠকর্মে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। আমাদের সমাজে বাস্তবায়িত এ দুর্নীতি সমূহের চিত্র এতই ভয়ংকর, নৃশংস ও নির্মমভাবে নিদারুন যে, এগুলিকে আর দুর্নীতি বলা চলে না–বরং এগুলিকে বলতে হয় অসুস্থ দুর্নীতি। কাজেই এর মাত্র গুটি কয়েক দৃষ্টান্ত দিয়েই আমি আমার লেখার এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানতে চাই। যেহেতু আমার লেখার উদ্দেশ্য কেবল ধর্ম সেবা তাই অত্র অধ্যায়ের কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি দিয়ে আমি শেষ করলাম, আর বাকী সবটুকু জানার জন্য পাঠক বন্ধুদেরকে সমাজ জীবনের চিত্র দর্শন ও পত্র পত্রিকা গুলিতে একটু নজর দিতে অনুরোধ করছি।

আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র কুরআনের সুরা আসরে বলেন, "কসম মহাকালের, নিশ্চয় ইনসান বড় ক্ষতির মধ্যে আছে"। সুতরাং মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপই ক্ষতির মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা আছে, যদি না সে সাবধানতার সাথে পা বাড়ায়। মূলতঃ মানুষ সেই অসাবধানতায়ই পা ফেলেছে, যার ফলে সে তার আধ্যাত্মিক জীবনকে হারিয়ে ফেলেছে। এবং জাগতিক জীবনকেও ধ্বংস করে ফেলেছে, অর্থাৎ জঙ্গলও বিগড়াইয়াছে দরিয়াও বিগড়াইয়াছে (সুরা আর রূম) সবদিক থেকেই মানুষ আজ ধ্বংসের অবশেষ প্রান্তে এসে পৌছেছে। তবে এ পরিণতির কী কোন পরিত্রাণ নেই? লোহা বাকা হলে পরে তা হাতুড়ি পিটা করে সোজা করা হয় আর হাতুড়ি বাঁকা হলে তাকে কিভাবে সোজা করা যায়? তার জন্য প্রয়োজন তপ্তানল, ঐ হাতুড়িকে কেবল আগুনে গলিয়েই সোজা করা সম্ভব। এর জন্য অন্য আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। পক্ষান্তরে দুর্নীতিগ্রস্থ এ মানব সমাজকেও সোজা পথে পরিচালনার জন্য আধ্যাত্মিক অগ্নিতুল্য আত্মার জগতে আগমন প্রয়োজন, যিনি তার আধ্যাত্মিক তপ্ততার তাপে জগতের সকল কুকর্ম ও কুপ্রবৃত্তি গুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ভস্ম করে প্রতিটি মানুষকে সুন্দর চরিত্র বৈশিষ্ট্য সাজিয়ে তুলবে, তখন প্রতিটি মানুষ বলবে হায়! জগত কতই না সুন্দর! তবে সত্য এটাই যে, এ শুভ কর্ম সাধনের লক্ষ্যে জগত বুকে আজ এক মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে যার পিতা প্রদত্ত নাম মির্যা গোলাম আহমদ কদিয়ানী। এবং তাঁর এ দায়িত্ব প্রাপ্তিতার পক্ষে আসমান ও জমিন সাক্ষি, আর আমি এ অধম সেই সত্যতার পক্ষেই আপনাদের নজর কড়ার চেষ্টা করছি, তবে যদি কেউ একথা মনে করেন যে, কেবল আমার কথার ওপর ভিত্তি করেই আমি আপনাদেরকে ঐ স্বর্গ প্রদত্ত প্রতিনিধি হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য বলছি তবে মনে করবেন যে আমিও ঠিক সেইরূপ এক দুরাচার দুর্নীতিবাজ যার বর্ণনা আমি ইতিপূর্বে দিয়ে আসছি, এখানে আমিও ঠিক একই রঙ্গের নরাধম যার কুৎসিৎ নিন্দা আমি এতক্ষণ করে আসছি।

হে পাঠক! আপনার সমীপে আমার আরজ এই যে, আপনি আপনার হৃদয় নিংড়ানো দোয়ার দ্বারা যুক্তি ও মুক্তির মাপ কাঠির দ্বারা বিবেক ও বুদ্ধির দ্বারা হাদীস ও কুরআনের আলোর দ্বারা জগত বিশ্বের পরিস্থিতির দ্বারা অতীতের জ্ঞান পন্ডিত ও বিজ্ঞান তাপসগণের নির্দেশনার দ্বারা আগত সেই ব্যক্তির আহ্বানকে পরখ করে নিন তিনি কী খোদার পক্ষ থেকে, না কোন এক ভন্ড জগত লোভী। নিশ্চয় আপনি এক্ষেত্রে নির্ভূল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন, কারণ এ কাজে আল্লাহ্‌তাআলাই সহায়। আর যদি আপনি তা না করে ফতওয়া অথবা বোমা হামলার দ্বারা অমুসলমান ঘোষণার শ্লোগান দ্বারা সুন্নতি লাঠির ভয়ের দ্বারা সেই সত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তবে তা হবে আপনার জন্য মহা এক ক্ষতির কারণ এরজন্য বরং আপনি মহাশক্তিধর খোদার ক্রোধাগ্নির কুপে পড়ে বিনাশ প্রাপ্ত হবেন, কারণ মাথার মাতাল দিয়ে যেমন আকাশে উদিত সূর্যটিকে ঢেকে রাখা যায় না তেমনিভাবে আপনিও আপনার এ হীন অপচেষ্টার দ্বারা ধর্মজগতে উদিত প্রদীপ্ত এ সূর্যকে ঢেকে রাখতে সমর্থ হবেন না। কারণ এটা খোদার স্বহস্তে রোপিত এক বৃক্ষ যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলবে।

আপনি লক্ষ্য করুন যে সেই সত্যদীপ্ত পুরুষ এ ব্যাপারে কি বলেছেন তা আপনি তাঁর নিজ মুখ থেকেই শুনুন, তিনি বলেছেন, " হে ঘুমন্ত জগৎ! তোমরা জাগ এবং আমাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর জগৎবুকে কার আগমন হয়েছে, কেননা আমি নিজ হতে কোন দাবী করছি না, সেগুলি কি কোন দৃষ্টি সম্পন্ন চক্ষু যেগুলো কিনা কোন সত্যবাদীকে চিন্তে ব্যর্থ হয়? সেকি কোন জীবন্ত মানুষ যে কিনা ঐশী আদেশ সম্বন্ধে অনবহিত? আমি মুখ দিয়ে যা বলি তা আমার নিজের কোন কথা নয় বরং খোদার নির্দেশগুলিই বলি আর হাত দিয়ে যা করি তা খোদার হাতের শক্তির দ্বারাই করি। আমি খোদা প্রদত্ত সেই পাথর যার ওপর এসে কেউ পড়বে সে-ও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আর আমি যার ওপর নিপতিত হবো সে-ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। একাজে আমি তো দেখছি আমার বিজয় অতি সন্নিকট কিন্তু যারা ধর্মান্ধ তারা তা দেখতে পাচ্ছে না পক্ষান্তরে পবিত্র চক্ষু বিশিষ্টগণ সেই দৃশ্য দর্শনে পাগল পাড়া দৌড়ে আসছে যাদের সাথে খোদার ফেরেশতাগণও রয়েছেন অতএব আমাকে প্রত্যাখ্যান করার পূর্বে অর্বুদবার ভেবে চিন্তে খোদার সাথে বাক্যালাপ করতঃ সিদ্ধান্ত নিন, এটাই হবে আপনার জন্য কল্যাণকর, যারা এজগতে আমার সাথে থাকবে আমি আশা করি যে, পরজগতেও তাঁরা আমার সাথেই থাকবে।"

এখানে ভাবনার অবকাশ থাকে যে, দুনিয়াতে এমন কোন নির্বিক শক্তিমান ব্যক্তি আছেন কি যিনি কিনা এমনি ধরনের দৃঢ় উক্তি রাখতে পারেন অথচ খোদার সাথে তার কেনা সম্পর্ক নেই? আদৌ নহে যদি তা-ই হয় তবে আত্মার মুক্তি পিয়াসীগণ একবার সেই সত্যের সন্ধান নিবেন কি?

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজলে-ই-ইলাহী

মহান ত্যাগের মাধ্যমে
ইসলামের প্রচার ও প্রসার লাভ

(দ্বিতীয় কিস্তি)

যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেন, **ওয়া ইয ইয়ারফাউ ইব্রাহিমুল ক্বাওয়ায়েদা মিনালবাইতে ওয়া ইসমাঈল রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামিউল আলীম,** অর্থাৎ এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল এই গৃহের ভিত্তি উঠাইতেছিল, (এবং দোয়া করিতেছিল) হে আমাদের প্রভু! আমাদের নিকট হতে (এই সেবা) গ্রহণ কর নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। (২ঃ ১২৮)

উপরোক্ত আয়াতটির আলোকে বুঝা গেল বাইতুল্লাহ্ শরীফকে পবিত্র করার পেছনে এক মহাকুরবানী নিহিত আছে। আর এ বাইতুল্লাহ্ শরীফই হল ইসলামের মূল উৎপত্তিস্থল। সুতরাং আয়াতটিতে আল্লাহ্তাআলা বাইতুল্লাহ্ শরীফ উল্লেখ করার পাশাপাশি ইসলামের বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং ইসলামকে কায়েম করার জন্য ইব্রাহীমের সেই দোয়াও রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেন, **রাব্বানা ইন্নি আসকানতু মিনযুররিয়্যাতি বেওয়াদিন গাইরি যীয়াররিন ইন্দা বাইতেকাল মুহাররাম রাব্বানা লি ইয়ুকিমুসসালাতা ফাযাআল আফইদাতাম মিনান্নাসে তাহভি ইলাইহিম ওয়ারযুকহুম মিনাসসামারাতে লাআল্লাহুম ইয়াশকুরুন।** অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমার বংশধর হতে কতককে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় বসতী স্থাপন করাইয়াছি। হে আমাদের প্রভু! যেন তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি লোকদের অন্তঃকরণকে এরূপ করে দাও যেন তারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তাদিগকে ফলফলাদির রিযিক দান কর, যেন তারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (১৪ঃ ৩৮) উপরোক্ত আয়াতটিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্তাআলা মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (আল-কুরআন) নাযেল করতে যাচ্ছেন আর এ কুরআনের বাণীর মাধ্যমে আরবের যে নব পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে তা পূর্ব হতেই মহাপরিকল্পনা এবং মহান ত্যাগের ফলশ্রুতিতেই হবে। কেননা, যখন ইব্রাহীম (আঃ) ফারানের মরুপ্রান্তরে তাঁর শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও বিবি হাজেরাকে রেখে আসলেন এজন্য যে, একদিন সেই মরুপ্রান্তর হতে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হবে, যেখান থেকে সারা দুনিয়াতে একত্ববাদের ধ্বনি বিস্তৃতি দান করবে। যাঁর নযীর ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কোথা ও পাওয়া যায়নি। আর সে জন্য তাদের সমস্ত বুদ্ধি মেধা শক্তি এবং জান মাল ইজ্জত বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ্তাআলার একত্ববাদের মানকে সমুজ্জ্বল রাখবে। মোটকথা, বলতে গেলে একটি ত্যাগী জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আর ঐশী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্যই মক্কানগরী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যেখানে পুর্বে কোন ফলফলাদির ব্যবস্থা ছিল না, ছিল অনুর্বর জনশূন্য এক অঞ্চল। সেই স্থানে জীবনের কোন চিহ্ন এবং জীবন ধারনের কোন উপায় এবং উপকরণও ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্তাআলার পরিকল্পনা এমন যে, তিনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার কবুলিয়ত স্বরূপ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে এবং তাঁর ও তাঁর সাহাবাদের কুরবানীর মাধ্যমে মানবজাতির জন্য আল্লাহ্তাআলার শেষ বাণীর ক্রিয়াকর্মের অপূর্ব প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আর এ ঐশী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যম রূপে মনোনীত হয়েছেন হযরত ইসমাইল (আঃ)। অপরদিকে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ)-এর দোয়া পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে কেবল আরবের অধিবাসীগণই তাদের পুজার নৈবেদ্য করতে মক্কায় আসতো কিন্তু আজ দেখুন, তাঁর আবির্ভাবের ফলে বিশ্বের সকলস্থান হতে দলে দলে লোক মক্কায় যিয়ারতের জন্য সমবেত হয়, যা অন্যদের জন্য উৎকৃষ্ট এক নমুনাস্বরূপ। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিশ্ব নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আবির্ভাবের জন্য যে দোয়া করেছিলেন তা পবিত্র কুরআনে স্বর্ণাক্ষরে রেখে দিয়েছেন,- যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তালা এরশাদ করেন, **রাব্বানা ওয়াবে আস ফীহিম রাসুলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতেকা ওয়া ইউআল্লেমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইয়ুজাক্কিহিম ইন্নাকা আন্তাল আযীযুল হাকীম।** অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! তুমি তাহাদের মধ্য হতে তাহাদের জন্য এক রসূল আবির্ভূত কর, যে তাহাদের নিকট, তোমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করবে। এবং তাহাদিগকে পূর্ণ কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে। এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করবে, নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়। (২ঃ১৩০) উক্ত আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে একজন মহানবী আসার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানান। যিনি (আবির্ভূত) হয়ে তাহাদের মধ্যে ১। আল্লাহ্র নিদর্শন বর্ণনা ২। পরিপূর্ণ শরীয়ত গ্রন্থের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে চিরন্তন হেদায়াত প্রদান। ৩। এতে অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান ও হিকমত শিক্ষাদান এবং ৪। জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনায় এমন একটি সুষ্ঠু নীতি ও আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাবেন যা তাদের জীবনে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনয়ন করবে এবং যার ফলে তারা এক মহৎ ও শক্তিধর জাতি হিসেবে সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া কবুলিয়তস্বরূপ ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪০ বৎসর বয়সে তিনি নবুওয়ত লাভ করেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বয়স যখন ৩০ বছর পার হলো,তখন তাঁর হৃদয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করার প্রেরণা পূর্বের চাইতেও বেশী হতে লাগলো। মক্কা শহরবাসীদের দুষ্টামি, খারাপি ও বদ কাজের প্রতি অতিষ্ট হয়ে অবশেষে মক্কা থেকে দুই তিন মাইল দূরে এক পাহাড়ে আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য একটি স্থান করে নিলেন। জায়গাটি ছিল পাহাড়ের উপরের দিকে পাথর ঘেরা ছোট্ট একটি গুহা। হযরত খাদিজা (রাঃ) এক সঙ্গে কয়েকদিনের খাবার তৈরী করে দিতেন। সেই খাবার নিয়ে তিনি হেরা গুহার ভেতরে চলে যেতেন। সেখানে পাথরের মধ্যে বসে তিনি দিন রাত খোদাতাআলার ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। (নবীনেতা পুস্তক হতে) আজকে তাঁর নবুওয়ত প্রাপ্তির দিনগুলি নিয়ে যদি আলোচনা করি, তাহলে বিরাট এক পুস্তকে পরিণত হবে। তাঁর জীবনে বহু ঘটনা আছে যা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। (চলবে)

হাসেম উল্লাহ্ সিকদার

এমটিএ ডাইজেস্ট

(এপ্রিল ১৬-৩০, ২০০০) স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগ করা উচিত কিনা ১৮ এপ্রিল সম্প্রচারিত (১১ই এপ্রিল ধারণকৃত) বাংলা মুলাকাত অনুষ্ঠানে স্টক এক্সচেঞ্জে অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত কিনা এ প্রশ্ন করা হলে হুযূর (আইঃ) বলেন, স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগ করা আত্ম-হত্যার নামান্তর। একে তো এর মধ্যে জুয়ার উপাদান রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘমেয়াদীভাবে এতে কেউ লাভবান হতে পারে না। কেননা শেয়ারের উঠানামা কিছু শক্তিশালী গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক ক্ষেত্রে ইহুদী মাফিয়ার হাতে এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। এ প্রসঙ্গে দু'টো বিপরীত বাস্তব ঘটনা বললে বিষয়ে স্পষ্ট হবে। এক আহমদী কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করে রেখেছিলেন। হঠাৎ কি মনে করে আমার পরামর্শ নেন। আমি তাকে জোর দিয়ে বলি, এখনই ক্ষতিতে হলেও আপনার সমস্ত বিনিয়োগ প্রত্যাহার করুন। তিনি সাথে সাথে শেয়ার বিক্রি করে দেন। এক সপ্তাহের মধ্যে শেয়ার মার্কেটে ধ্বস নামে। তিনি এতে টাকার ক্ষতির থেকে রক্ষা পান যে, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এক লক্ষ পাউন্ড চাঁদা দেন। আর ব্যাংকের সুদতো হারাম, তাই Real estate- এ- (অর্থাৎ জমি, বাড়ি বা এ ধরনের ব্যবসা) বিনিয়োগ করা উচিত। কেননা এর বাড়বেই। অপরপক্ষে আরেক ব্যক্তির এ ঘটনা আছে, যিনি নিজেও তার সমস্ত সম্পদ স্টক মার্কেটে বিনিয়োগ করে রেখেছিলেন আর অন্য আহমদীদেরও একই পরামর্শ দিচ্ছিলেন। আমি জানতে পেরে তাকে নিষেধ করি। কিন্তু, তিনি বিলম্ব করেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সর্বস্ব হারান। অন্য নামে লেখা একটা বাড়ি মাত্র তার বাকি ছিল।

যাকাত কার নিয়ন্ত্রণে ঃ খেলাফত না রাষ্ট্র

একই অনুষ্ঠানে হুযূর (আইঃ) কে প্রশ্ন করা হয়, ভবিষ্যতে আহমদী সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র যখন হবে তখন যাকাত কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, খেলাফত নাকি রাষ্ট্র? হুযূর (আইঃ) বলেন, যাকাত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আর রাষ্ট্রতো খেলাফতের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকবেই।

ভাষার উৎপত্তি

এ অনুষ্ঠানে ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন, ভাষা প্রথমে আল্লাহই শিখিয়েছেন। পরে তা ছড়িয়েছে, রূপান্তরিত হয়েছে।

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা যায়?

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা যায় কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) ২৫ শে এপ্রিল সম্প্রচারিত (১৮ই এপ্রিল ধারণকৃত) বাংলা মুলাকাত অনুষ্ঠানে বলেন না করা যায় না। প্রথম কথা এই যে, কোন রাষ্ট্রেই শতকরা একশত ভাগ নাগরিক মুসলমান নয়। রাষ্ট্র তো সকলের স্বার্থ রক্ষা করবে। তাই কোন বিশেষ ধর্ম একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম হতে পারে না। আর যদিওবা কোন দেশের শতকরা, একশ ভাগ মানুষ মুসলমান হয়ে যায় তবু স্মরণ রাখা দরকার যে, ইসলামের রাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। তাই এ ধরনের ঘোষণা অর্থহীন।

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

একই অনুষ্ঠানে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন, এ জোড়ার বিষয়ে প্রাণী জগতের ন্যায় উদ্ভিদ জগতেও রয়েছে। অন্য ফুলের রেণু দ্বারা পরাগায়ণ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এমনকি জড় জগতের সকল matter (পদার্থ) এর - anti-matter আছে। এভাবে জোড়ার বিষয়টি সর্বত্র বিরাজমান।

ইব্রাহীম (আঃ) এর আগুন

ইব্রাহীম (আঃ) কে যে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তার স্বরূপ সম্পর্কে এ অনুষ্ঠানে এবং অন্যান্য কিছু প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানের হুযূর (আইঃ) আলোকপাত করেন। এর অর্থ মোখালেফাত (বিরোধিতা-)- এর আগুন হতে পারে। তবে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)- এর দৃষ্টিভঙ্গী এই ছিল যে, সেটি যদি সত্যি কার আগুনও হয়, তবু আল্লাহ্তাআলা তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

সুন্নত ছেড়ে দিলে গোনাহ্ হবে কিনা

সুন্নত বাদ দিলে গোনাহ্ হবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিলে হবে নতুবা হবে না।

সংকলন - **আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক**

পাক্ষিক আহমদী চাঁদা

পাক্ষিক আহমদীর চাঁদার বছরের প্রায় ৪ মাস অতিক্রান্ত। এখনও যারা ২০০৫-৬ বছরের চাঁদা আদায় করেন নি তাদেরকে সত্বর চাঁদা আদায় করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

যারা স্থানীয় জামাতে চাঁদা দেন তাদেরকে রশিদের ফটোকপি পক্ষিক আহমদীর সম্পাদক বরাবর পাঠানের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। নচেৎ অফিস তাদের চাঁদার ব্যাপারে অনবহিত থাকার কারনে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে সমর্থ হয় না। চাঁদা আদায়ের খবর কেন্দ্রীয় অফিসে আসে অনেক পরে। স্থানীয় জামাতের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করা যাচ্ছে। তারাও যেন অর্থ বিভাগে চাঁদা রশিদ পাঠানোর সাথে সাথে অত্র অফিসে প্রত্যেক মাসের চাঁদা দাতার একটি তালিকা প্রেরণ করে আমাদেরকে সহযোগীতা করার জন্য অনুরোধ করছি।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের জন্য ১ (এক) জন বাবুর্চি নিয়োগ করা হবে।

প্রার্থীর যোগ্যতা ঃ

১. প্রার্থীকে অবশ্যই আহমদী মুসলমান হতে হবে।

২. প্রার্থীর বয়স অনুর্ধ্ব ৫০ বৎসর হতে হবে।

৪. রান্নার কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৫. কমপক্ষে ২০ জনের নিয়মিত রান্না ও বাজার করতে হবে।

৬. প্রার্থীকে আঞ্জুমান অঙ্গনে একক আবাসনে থাকতে হবে। পারিবারিক আবাসনের দাবী করা যাবে না।

৮. প্রার্থীকে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

৯. প্রার্থীকে কোন প্রকার টি.এ/ডি. এ প্রদান করা হবে না।

আবদনের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর, ২০০৬। প্রার্থীদের স্ব স্ব স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি, চারিত্রিক, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি এবং রন্ধনকার্যে অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে আবেদন করতে হবে।

কওসার আলি মোল্লা
জেনারেল সেক্রেটারী

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর জন্য একজন অফিস সহকারী আবশ্যক। নিম্নে বর্নিত যোগ্যতা সম্পন্ন আহমদী পুরুষ সদস্যদের নিকট থেকে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

(১) আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ২০ থেকে ৩০ এর মধ্যে।

(২) কমপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে।

(৩) এম,এস ওয়ার্ড, এক্সেল, ডাটা এন্ট্রি ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং জ্ঞানসহ বাংলা ও ইংরেজী কম্পিউটার টাইপ জানা থাকতে হবে।

(৪) জামাতের বিভিন্ন চাঁদাসহ অন্যান্য অংগ সংগঠনের চাঁদা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

(৫) উত্তম আখলাকের অধিকারী, নামাযী ও জামাতের যে কোন খেদমতের মন-মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে।

(৬) নির্বাচিত হলে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস প্রশিক্ষণ নিতে হবে (প্রশিক্ষণকালীন ভাতা প্রাপ্য হবেন) প্রশিক্ষণে উত্তীর্ন হলে প্রাথমিকভাবে চাকুরীতে নিয়োগ পাবেন।

(৭) প্রাথমিক ভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত প্রার্থীর পূর্ন ১ বছর শিক্ষানবিশ কাল হিসেবে গন্য হবে। এ সময়ে তার আচরণে ও কর্মে সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হলে তাকে কোন নোটিশ ও ক্ষতিপূরণ ছাড়া চাকুরী থেকে অব্যহতি দেওয়া যেতে পারে।

(৮) শিক্ষানবিশ কাল শেষে নির্ধারিত মহার্ঘ ভাতা সহ নিম্নে বর্নিত বেতন স্কেলে

স্কেল: ১৯৮০-৪৪-২৩৩২-৫৮-৩০২৮-৭২-৩৬০৪ বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

১। নাম :
২। পিতার নাম :
৩। স্থায়ী ঠিকানা :
৪। বর্তমান ঠিকানা :
৫। জন্ম তারিখ :
৬। জাতীয়তা :
৭। বয়াত গ্রহনের তারিখ/জন্মগত :
৮। শিক্ষাগত যোগ্যতা :
৯। অভিজ্ঞতা :

উপরোক্ত বিষয়াদির পুর্নাঙ্গ তথ্য ও প্রমাণ স্বরূপ প্রত্যয়ন পত্র সহ স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট এর স্বাক্ষরিত চারিত্রিক সনদপত্র ও সাম্প্রতিক কালের ৩ (তিন) কপি ফটো (স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সত্যায়ন সহ) আবেদনের সাথে সংযুক্ত করে ৩০ সেপ্টেম্বর-২০০৬ এর মধ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবর প্রেরণ করতে বলা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য প্রার্থিত বিষয়ে কোন তথ্যগত অসম্পূর্নতা থাকলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ
সেক্রেটারী ফাইনান্স

সকল স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবান,

রমযান মাস উপলক্ষ্যে সার্বিক তরবিয়তী কার্যক্রম

প্রিয় ভ্রাতা,
আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুলাহে ওয়া বারাকাতুহু।

রমযান মাস উপলক্ষ্যে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি রমযানুল মুবারকবাদ। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সদয় অনুমোদনক্রমে রমযান মাস উপলক্ষ্যে আপনাদের খেদমতে নিম্মোক্ত বিষয়গুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি :

(০১) প্রত্যেক জামাতে কেন্দ্রীয় মসজিদে/হালকা মসজিদে বা নামাযের জন্য নির্ধারিত জায়গায় নিয়মিত বা-জামাত ওয়াক্তিয়া নামায, তারাবির নামায ও দরসে কুরআনের ব্যবস্থা গ্রহন করুন।

(০২) মসজিদ বা নির্ধারিত নামাযের স্থান যাদের বাড়ী থেকে দূরে তারা নিজেদের বাড়ীতেই পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে আন্তরিক হোন।

(০৩) প্রত্যকেই যেন কুরআন তেলাওয়াত (সম্ভব হলে অর্থ সহ) ও নিয়মিত নামাযে তাহাজ্জুদের প্রতি সচেষ্ট হন। চেষ্টা করুন রমযানে সবাই যেন অন্তত: একবার কুরআন মজীদ (তেলাওয়াত) খতম করেন। সে বিষয়ে উদ্যোগ নিন এবং নিয়মিত নেগ্রানী করুন।

(০৪) জামাতের যেসব সদস্য/সদস্যা কুরআন নাযেরা জানেন না তাদের জন্য রমযান মাসে কুরআন শিক্ষার বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করুন।

(০৫) ২০ রমযানের মধ্যে তাহরিকে জাদীদ ও ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা আদায় করুন। যাতে করে হুযূর আনওয়ার (আই:)-এর খেদমতে দোয়ার জন্য নামের তালিকা পাঠানো যায়। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য/সদস্যাকে উপরোক্ত চাঁদায় শামিল করুন। যারা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল তারাও যেন সাধ্যানুযায়ী প্রত্যেকের নামে চাঁদা আদায় করেন।

(০৬) রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাফের ব্যবস্থা করুন। এছাড়াও এ বরকতময় মাসে মসজিদ সর্বদা ইবাদত ও যিকরে ইলাহীতে ভরপুর রাখুন।

(০৭) যারা একান্ত অপারগতার জন্য রোযা রাখতে পারবেন না তারা অবশ্যই ফিদিয়া প্রদান করবেন। এবছর শহরের জামাতের জন্য নূন্যতম ফিদিয়ার হার ৯০০/ (নয়শত) টাকা এবং গ্রামের জামাতের জন্য ফিদিয়ার হার ন্যূনতম ৬০০/= (ছয়শত) টাকা। যারা সামর্থবান তারা রোযা রাখা সত্বেও ফিদিয়া প্রদান করতে পারেন।

(০৮) এবছর ফিৎরানা ধার্য হয়েছে ৫০/ (পঞ্চাশ) টাকা। যারা অস্বচ্ছল তারা অর্ধেক হারে ফিৎরানা প্রদান করবেন।

(০৯) এম.টি.এ-তে হুযূর আনওয়ার (আই:)-এর খুতবা জুমুআ এবং কুরআনের দরস শোনার ব্যবস্থা করুন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো জামাতের সর্বস্তরের সদস্য/সদস্যাদের অবগত ও স্মরণ করানো উদ্দেশ্যে হালকা পর্যায়ে সাধারণ সভার আয়োজন করুন এবং রোযার শেষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের খেদমতে রিপোর্ট করুন।

মহান আলাহ্ আমাদের সবাইকে এ বরকতময় কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়নের তৌফিক দিন, আমীন।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার
মোহাম্মদ আব্দুল জলিল
সেক্রেটারী তরবিয়ত এবং তাহরীকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

রাজশাহী বিভাগীয় ৮ম বার্ষিক ওয়াকফে-নও তালীম তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন-২০০৬ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তাআলার খাস ফযলে ১৯ মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত ৭ দিন ব্যাপী রাজশাহী-১ বিভাগীয় ওয়াক্‌ফে-নও তালীম তরবিয়তী ক্লাস ও সম্মেলন-২০০৬ আহমদনগর অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪০ জন ওয়াক্‌ফে-নও মোজাহিদ অংশ গ্রহণ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী। প্রফেসর রাজিব উদ্দীন আহমদ বিভাগীয় সেক্রেটারী স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মহীউদ্দীন (এডিশনাল সেক্রেটারী), মৌলভী এহতেশামুল বশীর (স্থানীয় প্রেসিডেন্ট), মৌলভী আব্দুর রহমান, (প্রেসিডেন্ট শালসিঁড়ি) এবং মাওলানা রবিউল ইসলাম (মুরব্বী জুনিয়র)। ৭ দিন ব্যাপী ক্লাসে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে মৌলভী ইসরাঈল দেওয়ান, মাওলানা রবিউল ইসলাম, মোয়াল্লেম মুনীর হোসেন খান এবং মোয়াল্লেম শাহ আলম খান।

অনুরূপভাবে, ৭ দিনব্যাপী রাজশাহী-২ এর অনুষ্ঠান তেবাড়িয়া, নাটোর-এ ২৪ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত চলে। ন্যাশনাল সেক্রেটারী মহোদয় বিশেষ কারণবশতঃ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করতে না পারায় বিভাগীয় সেক্রেটারী প্রফেসর রাজিব উদ্দীন আহমদ-এর সভাপতিত্বে বিকাল ৪টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। বক্তব্য রাখেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মহসীন আলী এবং জুনিয়র মুরব্বী আক্রামুল ইসলাম, মোয়াল্লেম কামরুল ইসলাম প্রধান ও মোয়াল্লেম মাহমুদুল হাসান মিনহাজ। মোট ২২ জন ওয়াক্‌ফে-নও মোজাহিদ এতে অংশ গ্রহণ করে। এছাড়া ১১ জন মাতা ও ২ জন পিতা নিয়মিত ক্লাস করেন। ন্যাশনাল সেক্রেটারী সাহেবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২৯ জুন পর্যন্ত নিয়মিত ক্লাস পরিচালিত হয়। এছাড়া তিনি প্রত্যহ বাদ আসর পিতা-মাতাদের উদ্দেশ্যে তরীবয়তমূলক বক্তব্য রাখেন। ৩০ জুন সম্মেলন দিবসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গৃহীত হয়। সমাপনী অধিবেশনে ন্যাশনাল সেক্রেটারী সাহেবের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ, সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সংবাদদাতা ঃ প্রফেসর রাজিবউদ্দিন আহমদ, ওয়াক্‌ফে-নও সেক্রেটারী, রাজশাহী বিভাগ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে নাসেরাত বিদস পালন

নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে বিগত ১৮-০৮-২০০৬ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ নাসেরাত দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট মোহতরমা দিলরুবা বেগম (মায়া) এর সভাপতিত্বে উক্ত সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তজমা পেশ করেন খাওলাদীন উপমা। বাংলা ও উর্দূ নযম পাঠ করেন নিগার সুলতানা, তাসনুভা তাহের তৃণা, সুলতানা নাসিরা, মর্জিয়া বেগম, ফারিজা তাসফিয়া। উক্ত সভায় নামাযের গুরুত্ব, মালী কুরবানী, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বাল্যজীবন সত্যবাদিতা সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ১) খাওলাদীন উপমা ২) ইশরাত জাহান রিয়া ৩) তানজিদা আহমদ শান্তা ও আফরিন আহমদ হিয়া।

উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৫ জন লাজনা ও ২০ জন নাসেরাত বোনেরা উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না
জেনারেল সেক্রেটারী, লাজনা ইমাইল্লাহ্
নারায়ণগঞ্জ

চট্টগ্রাম মজলিসে আনসারুল্লাহ্'র বার্ষিক ইজতেমা

মজলিসে আনসারুল্লাহ্, চট্টগ্রামের উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী ৩১তম বার্ষিক ইজতেমা গত ২৫, ২৬ আগষ্ট, ২০০৬ ইং শেষ হয়। অনুষ্ঠানের কর্মসূচীতে ছিল ইসলামী চিন্তাবিদগণের বক্তৃতা, কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা, ধর্মীয় জ্ঞানের উপর প্রতিযোগিতা, দ্রুত হাঁটা প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং বা'জামাত তাহাজ্জুদ নামাযসহ আকর্ষণীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান। দুই দিন ব্যাপী এ কর্মসূচীর তিনটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে সর্বজনাব কাওসার আলী মোল্লা, জনাব মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। তিনটি অধিবেশনের বক্তৃতা পর্বে মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য, ওসীয়্যতের গুরুত্ব, এতায়াতে নেযাম, আদর্শ দাঈ ইলাল্লাহ'র বৈশিষ্ট্য, ওয়া মিম্মা রাজাকনাহুম ইউনফিকুন"-এর তাৎপর্য সম্পর্কে সর্বজনাব মাওলানা আব্দুল মতিন, মাহমুদ হাসান সিরাজী, মাওলানা মনিরুজ্জামান ভূইয়া, মাওলানা আব্দুর আজিজ সাদেক,আব্দুর রশিদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন। সমাপনী অধিবেশনে বক্তৃতা পর্বের শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরিশেষে বিশ্ব মানবতার কল্যাণে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে এ সমাবেশ সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ হাসান
যয়ীমে আলা, মজলিসে আনসারুল্লাহ্, চট্টগ্রাম

শোক সংবাদ

আমরা অতীব দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব জামাল নেওয়াজ খাঁন, গ্রাম-দেবগ্রাম, থানা আখাউড়া, জেলা-বি-বাড়ীয়া গত ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার সকলা-১১.৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭২ বৎসর তিনি স্ত্রী, তিন কন্যা, নাতি-নাতনিসহ পরিবারের নিকটাত্মীয় ও বহু শুভাকাঙ্খী রেখে যান। আল্লাহ্‌র ফযলে তারা সকলেই আহমদীয়া সিলসিলার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোক সন্তপ্ত পরিবারকে মহান আল্লাহ্‌তাআলা ধৈর্যধারণ করার তৌফীক দিন এবং তাঁকে জান্নাতের মোকাম জান্নাতু ফেরদৌসে অধিষ্ঠিত করেন। তজ্জন্য জামাতের সকলের নিকট খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করছি।

মোসায়েরা খানম

আনসারুল্লাহ্ উদ্যোগে সুন্দরবন জামাতে মাস ব্যাপী বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন

গত ১৫ই জুলাই হতে ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত, এক মাস ব্যাপী বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন করেছে। (আলহামদুলিল্লাহ্) মোট ৩৬০টি ফলজ ও কাঠের চারা গাছ রোপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন স্থানীয় জয়ীম আলা জনাব আহমদ আলী মোল্লা সাহেব। আল্লাহ্তাআলা সকলের প্রতি হাফেয, নাসের ও হাদী হউন, আমীন

এস, এম মহিবুল্লাহ, উমুমী
সুন্দরবন মজলিসে আনসারুল্লাহ্, সাতক্ষীরা

দোয়ার আবেদন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের মৌড়াইল নিবাসী প্রবীন আহমদী জনাব শেখ আব্দুল আলী পোষ্ট মাষ্টার (অবঃ) দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ আছেন। তিনি একজন মোখলেস আহমদী এবং জামাতের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তাঁর আশুরোগ মুক্তি ও দীর্ঘায়ুর জন্য সকল আহমদী ভাই বোনদের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মোঃ বশির আহমদ
মৌড়াইল, বি-বাড়ীয়া জামাত

শাহ মাহমুদ রায়হান চপলের বিয়ে

আমাদের সর্বপ্রথম সন্তান ও একমাত্র পুত্র শাহ মাহমুদ রায়হান (চপল) এর শুভ বিবাহ রাশিয়ার অধিবাসী পিতা-লাদিমী পেত্রোবীচ সাহেবের (একমাত্র সন্তান) কন্যা ইউলিয়ানোভা ভিয়েরা (জান্নাতুন নাহার) এর সাথে ০১ (এক) লক্ষ টাকা মোহরানা ধার্যে সম্পন্ন হয়। বিবাহের এলান করান রাশিয়ার কাজান ষ্টেট এর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাওলানা হাফিয সাঈদুর রহমান সাহেব। বহু গুণিজন ও আহমদী পাকিস্তানী পরিবার উপস্থিত ছিলেন। গত ২/৭/০৬ ইং তারিখে কাজন মসজিদে বাদ যোহর উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয়।

মাহমুদা রুমানা ইসলামের বিয়ে

আমাদের জ্যৈষ্ঠকন্যা মাহমুদা রুমানা ইসলাম এর শুভ বিবাহ ঢাকার সেঞ্চুরী টাওয়ার এ্যাপার্টমেন্ট সি-১৭, বড় মগবাজারস্থ জনাব মোস্তাক আহমদ সাদেক সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র আমেরিকা নিবাসী ইফতেখার মাহমুদ এর সাথে ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা দেন মোহরানা ধার্যে সম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহ এলান, আঃ মুঃ জাঃ বাংলাদেশ এর দারুত তবলীগ মসজিদে গত ২১/০৪/২০০৬ ইং তারিখে মোহতরম মুরুব্বী সিলসিলা উক্ত বিবাহ এলান করেন। আমরা আমাদের পুত্রও কন্যার বিয়ে যাতে শান্তিময় সুখময় ও দীর্ঘায়ু হয়, সেজন্য জামাতে আহমদীয়ার সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি।

শাহ মাহমুদ জাকির ও রহিমা জাকির

শুভ বিবাহ

* গত ২৫/০৩/০৬ জনাব নজরুল ইসলাম এর কন্যা মোসাম্মাৎ শাপলা বেগম সাং বলদী আটা জামালপুর এর সাথে জনাব মোহাম্মদ আঃ আউয়াল এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ ইমরান সাং মাটিকাটা বাদলাগঞ্জ ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ এর বিয়ে ৪৫,০০০/- (পয়তাল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিঃ নং ৫৫০/০৬

* গত ১১/১২/০৫ ইং জনাব কোরাইশী এর কন্যা মোসাম্মাৎ পারভীন কোরাইশী গ্রাম ও পোঃ তারুয়া, বি, বাড়ীয়া এর সাথে জনাব মোতাহার হোসেন এর পুত্র জনাব মাহমুদ আহমদ (সুজন) সাং তারুয়া-বি-বাড়ীয়া এর বিয়ে ১,২৫,০০০/- (একলক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিঃ নং ৫৫১/০৬

* গত ২০/০২/০৬ইং নূরুল ইসলাম এর কন্যা মোসাম্মাৎ সাবিনা ইয়াসমিন সাং পাঁচ পুরুলিয়া, নাটোর গুরুদাসপুর এর সাথে জনাব মৃত আশরাফউদ্দিন এর পুত্র জনাব আহসান শরীফ আজিজ মঞ্জিল প্লট, ৯৩ ১৩১ খালিশপুর হাউজিং খুলনা এর বিয়ে ৬০,০০১/- (ষাট হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিঃ নং ৫৫২/০৬

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমার আম্মাজান মিসেস আছিয়া খাতুন (তারুয়া জামাতের সদস্যা) গত ০৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০০৬ রোজ সোমবার ভোর ৩.১০ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বৎসর। তিনি ছিলেন দুই পুত্র ও সাত কন্যা সন্তানের জননী। এছাড়াও তিনি নাতি-নাতনী, আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাতের এবং জান্নাতে সম্মানিত স্থান লাভের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

আব্দুর রহীম
ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল

দোয়া চাই

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, চলতি বৎসর, ২০০৫-২০০৬ ইং শিক্ষা বর্ষে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা এর অধিন হলিক্রস কলেজ থেকে আমাদের একমাত্র কন্যা নাজ আফরিন সুলতানা নাজ GPA-5 (A^+) গ্রেড পয়েন্ট পেয়ে সাফল্য অর্জন করেছে, আল্-হাম্দুলিল্লাহ। গত দুই বৎসর পূর্বে নাজ ভিকারুন্নেছা নূন স্কুল ও কলেজ থেকে পরীক্ষায়ও অনুরূপ গ্রেড পয়েন্টে GPA-5 (A^+) লাভ করেছিল, আল্ হাম্দুলিল্লাহ নাজের এ সাফল্যের জন্য জামাতের সকল সদস্য-সদস্যার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যারা দোয়ার দ্বারা সাহায্য করে আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তার এই মেধা ও সাফল্য যেন ভবিষ্যতে আরো উত্তোরত্তর বৃদ্ধি লাভ করে এবং নাজের ব্যক্তি জীবনে এবং জামাত তথা দেশ ও জাতীয় কল্যাণে অবদান রাখতে সক্ষম হয় সেই জন্য জামাতের সকলের খেদমতে বিনীত দোয়ার দরখাস্ত পেশ করছি।

বিনীত :
শফিক আহমদ
জয়ীমে আলা, ঢাকা-১ ও
মিসেস মরিয়ম সুলতানা (নীনা)
সেক্রেটারী মাল, লাজনা ইমাইল্লাহ- বাংলাদেশ

জলই জীবন / WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয়

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্ব প্রথম ফল পাবেন। (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems) - ১০ দিন। (৩) উচ্চ রক্তচাপ-(Hipertension) ১ -মাস (৪) বহুমূত্র (Diabetes) - ১ মাস (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) - ৩ মাস। (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases) - ৩ মাস (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland) - ৩ মাস। (৮) কর্কট রোগ (Cancer) প্রথম থেকে রোগ ধরা পড়লে - ৬ মাস। (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ - ১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাত রাস, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমান জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছামত জলপান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ্য চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি

রেস্তোরা ১ নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১,
গুলশান ২, ঢাকা ১২১২।
ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫১৯২২

ধানসিড়ি

খাবার
অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে
ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

৩৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN,
PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 69 ■ 5th Issue
Fortnightly

The AHMADI

15 September, 2006. ■ Tk. 10.00
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

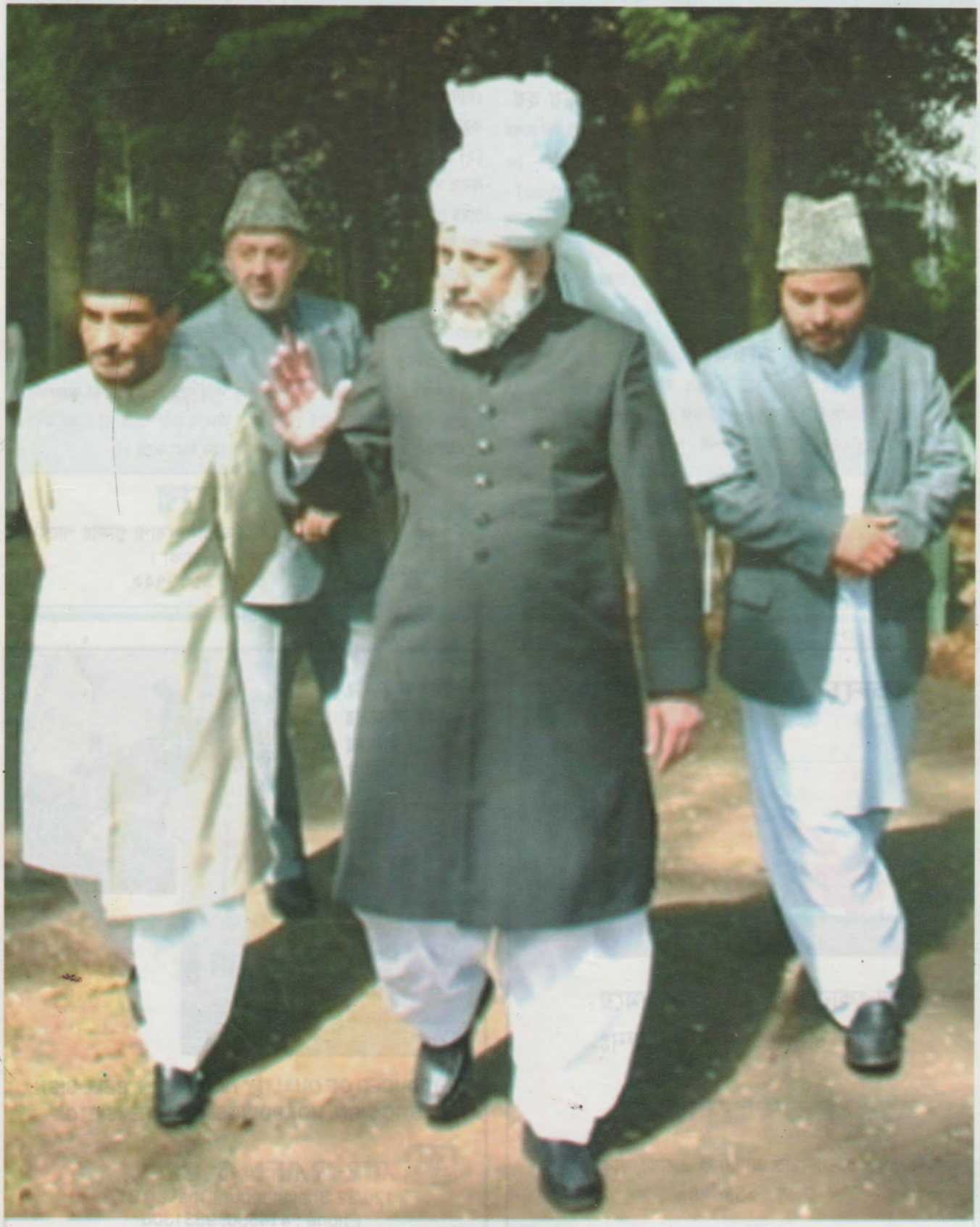

Huzoor (atba) in Holland

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com